কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

চুয়ার বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৪২৮



কৃশানু

একটি মননশীল সাহিত্য পত্রিকা

চুয়ান্ন বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৪২৮

৩০/১এ, কলেজ রো, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
krishanupatrika@gmail.com

কৃশানু

চুয়ান্ন বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৪২৮

সম্পাদক : মনন দাস

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৩,

প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রেবতী ভূষণ ঘোষের জন্ম শতবর্ষে তাঁর চিত্রিত বিশেষ রচনা পুনর্মুদ্রিত ঃ শিং সৃষ্টি / লেখা ঃ মনন দাস ৫

কবিতা ও ছড়া ঃ অসীম দাস ২৪, অমর কুমার দাস ৩১, অনুপ কুমার ঘোষ ৩২, অসিকার রহমান ৩৭, অলোক শ্রীমানী ৪০, অর্পিতা ঘোষ পালিত ৩১, অষ্টপদ মালিক ৪২, অমৃতা বিশ্বাস সরকার ৪৫, অমিত দাস ৪৭, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ৪৮, অমিতাভ সরকার ৪৬, অঞ্জনা চক্রবর্তী ৪৯, অন্তরা সিংহ রায় ৫৬, অস্ট্রিক ঋষি ৫৮, আবদুল্লাহ আল রিপন ২৭, কার্তিক মণ্ডল ৩৪, কেয়া মৈত্র ৫০, ক্ষুদিরাম নস্কর ১৬, গুরুশরণ ব্যানার্জী ৪৫, চন্দনা দেবনাথ ৩৩, চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী ৫৩, ডা: সমীর কুমার বেতাল ৫৭, তীর্থঙ্কর সুমিত ৫৬, দীপঙ্কর চৌধুরী ৩৮, দীপ কুমার ৪৩, দীপান্বিতা হক ২৩, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় ২৮, দেবাশীষ পাড়ুই ৪৪, দর্শন সাহু ১৬, দুলাল সুর ৩৬, ধ্রুব বসু ৪১, নীপা চক্রবর্তী ২৯, পলি ঘোষ ২৭, প্রবীর দাস ৫৫, প্রশান্ত কুমার মণ্ডল ৪৭, পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় ৩০, ফটিক চৌধুরী ২৫, ব্রততী ৩৯, বাসু দেব দাস ১৫, বিক্রমজিৎ ঘোষ ২৩, বিদিশা চট্টোপাধ্যায় ৫১, বি. কে. স্বপন ২৬, বৈদ্যনাথ ধাড়া ৪০, ভগীরথ সর্দার ৩৫, মাফরুল আলম ৪৪, মানস চক্রবর্তী ২৯, মুরলী চৌধুরী ৩০, মিঠুন মণ্ডল ৩৫, মোনমাঝি মনীষা ২৪, রনিতা দাস ৫৮, রাহগীর ৫৪, রূপক চট্টোপাধ্যায় ৩৮, শচীন কর্মকার ৫০, শাজাহান কবির ৩৩, শ্যামলী বালা ৫৫, শিবনাথ মণ্ডল ১৫, শূলপাণি শর্মা ২২, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯, সজল কুমার টিকাদার ৪৬, সম্পা পাল ৪৮, সমরেশ মণ্ডল ২৬, সঞ্জিত মণ্ডল ২৫, সমর সুর ৩৭, সন্ধ্যা রং ৫৭, সায়ন্তী হাজরা ৩৪, সুজয় মজুমদার ৪৬, সুনীল কুমার মণ্ডল ১৭, সুদীপা সাহা ৫৮, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬, সুবীর ঘোষ ৪১, সুব্রত মাইতি ৫১, সৌভিক শী ১৭, স্বপন নাগ ২৮, স্বাগতা ভট্টাচার্য ৪২, স্বপন শর্মা ৪৯, স্বরূপ সিংহরায় ৫২।

গল্প ঃ অনুপ কুমার আচার্য ৮৬, অযান্ত্রিক ৭৩, উৎস ভট্টাচার্য ৮১, চৈতালী রায় ৭৪, তরুণার্ক লাহা ৮৪, বিজলী শীল ১৮, রঞ্জন ব্যানার্জী ৮৩, সুনির্মল বসু ৯৩, সাইদিয়া রফিকুল হক ৭৭, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল ৬৯।

প্রবন্ধ ঃ ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী / বিপন্ন সময় ৬২, প্রবীর বিকাশ সরকার / রবীন্দ্রভক্ত শিল্পী আকিনো ফুকু ৫৯, রাজা দেবরায় / মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৬৬, সুকান্ত সেনগুপ্ত / সচেতনতা ও স্বাস্থ্য ৬৫।

ইলাস্ট্রেশান ও প্রচ্ছদ	**কম্পিউটার গ্রাফিক্স**	**প্রচার ও জনসংযোগ**
শৈলেন পাত্র	প্রদীপ মণ্ডল	ডাঃ সমীর কুমার বেতাল

সম্পাদকীয়—

করোনা কাল পৃথিবীতে এক অভিশপ্ত অধ্যায়। সেই অধ্যায় থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে। মায়ের কাছে একান্ত প্রার্থনা এ অধ্যায় আর যেন ফিরে না আসে। এই অবস্থায় নানা অসুবিধা ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা কৃশানু প্রকাশে সচেষ্ট। শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করতে একটু দেরি হয়ে গেল। দীর্ঘ চুয়ান্ন বছরের পথ চলার পুরোনো ও নবীন সাথী কৃশানুর সকল সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাই। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন।

মনন দাস
সম্পাদক



স্কেচ - বিনয় ভড়

শিশু কিশোর বিভাগ

রেবতীভূষণ জন্ম শতবার্ষিকী স্মরণে

শিং সৃষ্টি

অঙ্কন - রেবতীভূষণ ঘোষ,

লেখা - মনন দাস



বঙ্কুবাবুর ছাগলছানা
দেখতে যেন হরিণপানা
এমনই তার গায়ে রঙের বুটি,
দূরের থেকে দেখলে পরে
মনে হবেই হরিণ চরে
কোলেতে নিই গিয়ে গুটি গুটি।
সবাই যখন বলল এসে
হরিণ এটা হবেই শেষে
বঙ্কুবাবু চিন্তা ভাবনা ভুলে,
নাম রাখলেন 'হরিনন্দন'
গায়ে দিলেন দুধ চন্দন
রঙের বাহার যদিবা আরো খোলে।



যেমন লাফায় তেমন তাকায়
তেমন ছোটে, ঘাড়টি বাঁকায়
ছাগল ছানার হাজার গুণপনা,
        একমুখে আর বলেন কত !
        বঙ্কুবাবুর হিসাব মত
        দশ আঙুলে যায়নাকো তা গোনা।
শুনে শুনে দুকান ভ'রে
প্রতিবেশীর রা না সরে
মাথা নেড়ে হুঁ হুঁ শুধু বলেন,
        বেজায় খুশী বঙ্কুবাবু
        বুকটা ফুলে হয় যে তাঁবু
        আহ্লাদেতে মাখন যেন গলেন।



কিন্তু যখন মহোৎসাহে
ছাগলছানা গানটি গাহে
ব্যা ব্যা ব্যা, বু বু বু বুঁহু,
    বঙ্কুবাবু ভাবেন বসে
    হরিণের ডাক কেমনটি সে
    কা কা কা, নাকি কুহু কুহু ?
এমন করে বছর গেল
শিং গজানোর সময় হলো
বঙ্কুবাবুর ঘুম যে গেল ছুটে,
    দেখাতো নয়- পর্যবেক্ষণ
    গবেষকের দৃষ্টি বর্ষণ
    প্রতিটি দিন সাত সকালে উঠে।



বাঁকা শাখার সাজন দিয়ে
শৃঙ্গ দুটি মাথায় নিয়ে
তবেই নাকি হরিণটি সুন্দর!
তা না হলে কিসের তারিফ?
যতই করুক হুপ্ হুপ্ হিপ
মুগ্ধ চোখে কে দেখে বান্দর?

বঙ্কুবাবুর ভাবনা ভারি
খাটবে না আর জারিজুরি
হায়রে এখন সবাই কি বা কবে?
ছাগল ছানা হবে হরিণ
গাছের মত গজাবে শিং
এমনটি তার ভাগ্যে কি আর হবে!

করতে হবে যা হোক কিছু
নইলে মাথা হবে নীচু
মাথার উপর কিছু ঘটার আগে,
তুক্ তাক্ আর ওষুধপত্র
যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র
দৈব কিংবা বিজ্ঞান- যা লাগে।

কবিরাজ আর গো বদ্যি
ডাক্তারি পাস করা সদ্যি
ঝানু বিশেষজ্ঞ, কিংবা হেকিম,
বলেন শুনে – হায় ভগবান
চিকিৎসাটা আপনি করান
এযে দেখি নিম গাছেতে সিম !
শুনে রাগে মগজ নড়ে,
'কি করে পাশ এরা করে ?
কিছুই করেনিকো পড়াশোনা !
হায় কি হলো দেশেরই হাল
সামান্য কাজ করতে নাকাল,
জ্ঞানগম্যি হাটে কি যায় কেনা ?'



তাবিজ কবজ বাবাদুলি,
ঝুলল গলায় মাথায় খুলি
চন্দনেরই প্রলেপে দেন ঢেকে,
কালো দুটো শিং যে তবু
ক্রমেই বেড়ে ছুঁচলো, কভু
শাখা তাতে বেরোয় নাকো বেঁকে।

অনেক খুঁজে অবশেষে
ধান্দাপুরের বান্দা এসে
বলেন, -'স্বপ্নে পেয়েছি আদেশ,
শাপভ্রষ্ট হরিণ আছে
শ্রী বঙ্কিম দাসের কাছে
ধরে আছে ছাগল ছানার বেশ।'
'পুনরুদ্ধার করার কাজে
তাঁর আগমন ধরার মাঝে
এখানেতে হবেন অধিষ্ঠিত,
ছাগল কেমন হরিণ হবে
মনে না আর দুঃখ রবে
বঙ্কুবাবু হবেন আনন্দিত।'

অবাক বঙ্কুবাবু ভাবেন
মহাপুরুষ কোথায় ছিলেন!
এলেন দৈববাণী বহন করে,
সকল দুঃখ দূরে গেল
শুকনো ডালে ফুল গজালো
আনন্দেতে চিত্ত গেল ভ'রে!
খরচের নেই হিসাব নিকাশ
হরিণের শিং হবে বিকাশ
এটা কি আর চাট্টিখানি কথা!
বঙ্কুবাবু দরাজ হস্ত
ফর্দ যতই হোক না মস্ত
খরচ করে যাবেন যথা যথা।



যাগযজ্ঞ সমাপনে
বান্দা গেলেন গঙ্গাস্নানে
দক্ষিণাটি নিলেন পঞ্চশত,
দুদিন বাদে ফিরে এসে
দেখবেন শ্রী হরিণ বেশে,
বলে গেলেন দৈববাণীর মতো।
দুদিন ছেড়ে দুমাস যে যায়
একি হলো হায় হায় হায়
যেমন শিং তেমনই রয়ে গেল,
যাগযজ্ঞের ফল ফুলুরি
বদমাইশের জুয়োচুরি
গঙ্গা থেকে কেউ ফিরে না এলো।



বঙ্কুবাবু হতাশ হয়ে
ধারালো কাটারি দিয়ে
কাটেন ছাগল ?
না, না, - গাছের ডাল !
বাঁধেন কালো শিং এর উপর,
‘আহা ! দেখতে কি মনোহর’
তারিফ করে সবাই ফুলিয়ে গাল।



নাক ■ বাসু দেব দাস

উঁচু নাক নিচু নাক চ্যাপ্টা ও বোঁচা
নাকে শুকে নেয় চেখে লোভিরূপ ছোঁচা।
নাক শেটকায় কেউ গন্ধের তরে
নাকানি চোবানি কেউ সংসার করে।
নাক তোলা অভ্যাস অনেকেরই রয়,
ভুল করে নাক না নাড়লেই হয়।
নাকেতে নথবসড় উড়েদের বোল,
খাঁদা নাকের ঘড়ঘড়ানি পাড়ায় গণ্ডগোল।
নাকে খত দিয়ে কেউ প্রতিজ্ঞা করে,
নাক কান কাটা যারা ভুল করে মরে।
নাক কাটারি, নাক বরাবর সোজা গেলে আরো,
নাকের বদলে নোরুন পেয়ে যেতে পার।।



বাঁচাও বাঁচাও ■ শিবনাথ মণ্ডল



গাড়িঘোড়া বাড়ছে, বাড়ছে বাড়ি
কল কারখানা আর ধোঁয়ার গাড়ি।
গাছপালা কাটছে, পড়ছে চড়া
পৃথিবীটা একদিন হয়ে যাবে খরা।
তখন বন্ বন্ ঘুরবেনা ধরা
জগৎ তখন হয়ে যাবে মরা।
এসো সবে একসাথে শপথ করি
আমরাই জগৎ সবুজে ভরি।
অপচয় নষ্ট করবো না জল
দায়িত্ব রাখলে পাবোই সুফল।
সকলে বাঁচাও গাছ, প্রকৃতি বাঁচাও
পৃথিবীর সন্তান জীবদের বাঁচাও।
গাছ আমাদের বাঁচায় প্রাণ
গাছ কাটা বন্ধ হোক বিধান।

নতুন সকাল ■ ক্ষুদিরাম নস্কর

নতুন সকাল দেখবো বলে
ভোর বেলাতে উঠি,
আঁধার ফেলে আলোর খোঁজে
নদীর ধারে ছুটি।

জীবন থাকে শান্ত তখন
শিশুর মত সাদা,
পশু-পাখি জীব-জন্তু
সবাই ঘুমে কাদা।

পুবের আকাশ লাল হয়েছে
ভাঙাচ্ছে ঘুম পাখি,
বলছে ওঠো, সকাল হলো,
এখনও ঘুম বাকি?

অলস জীবন আর কতক্ষণ
বলছে রবির আলো,
এনেছি এক নতুন সকাল
সবার হবে ভালো।





পুজো এলো রে ■ দর্শন সাহু

এসেছে শরৎ – ফুর্তির মহরৎ
মাঠে মাঠে দোলে কাশফুল;
সেজেছে আকাশ, সেজেছে বাতাস
বাঙালির মন দোদুল।

বাড়ির পাশে শিউলি হাসে
গন্ধ আসে নাকে;
নেই দেরি নেই আসতে সেদিন
পড়বে কাঠি ঢাকে।

কুমোর গড়ে ভক্তিভরে
মাটির প্রতিমা;
সাজছে বাটী – পরিপাটি
ফিরবে ঘরে মা।

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
মন্ত্র বাজলো দূরে;
খোকন অবাক – হরেক পোশাক
উঠলো শোকেস ভরে।

মিষ্টি খুকুটি হাঁটে গুটি-গুটি,
যত্নে রেখেছে নতুন জামাটি তুলে;
বাবা-মার সাথে মেলায় যাবে সে
চুটকি বাঁধবে চুলে।

অন্য মন ■ সুনীল কুমার মণ্ডল

ইচ্ছে করে সকাল সকাল
শিশিরে পা ধুই
আমি কিংবা তুই।।

সবার মনে চাঁদের হাসি
সারা জীবন থাক
দুঃখ গুলো যাক।।

ইচ্ছে গুলো পূরণ করি
যে যার মতো চায়
সত্য লাগা গায়।।

হারান-হাসান মিলে মিশে
যমজ যেন ভাই
বিশ্বজুড়ে পাই।।

ধনীগুলো দরাজ মনে
হা-ভাতেদের পাশে
হাত বাড়িয়ে হাসে।।

বোমা বারুদ নষ্ট হবে
অস্ত্র হবে ফুল
যুদ্ধ করা ভুল।।

তখন দেখি রবি ঠাকুর
কিংবা নজরুল
গানে কানে দুল।।

ভণ্ড জ্যোতিষ তাবিজ পাথর
সাত সাগর পার
শনি-মঙ্গল হার।।

ভাবলে হবে, আমরা শুধু
বন মানুষের ভাই
মনে বন্য তাই।।





টাকা দাও দাদু ■ সৌভিক সী

সকাল সকাল বাড়িতে এসেছে
দাদুর নামে ফ্যাক্স।
সেখানে তাতে লেখা আছে
লাখ টাকা বাকি ট্যাক্স।
মনে মনে বসে ভাবে দাদু
কি করে এত হলো।
গত বছরেই তো ঠাকুমার নামে
কিছু কিছু লিখে দিলো।
বললাম দাদুকে কানে কানে
কর দাও কেন ফাঁকি।
তাতেই তো চলে আমাদের দেশ
তাতে আমরাই তো থাকি।

একনেত্র দেবতা ■ বিজলী শীল



মিঃ পার্কার আর মিস রুবেলা একসাথে এক অফিসে চাকরির সূত্রে পরস্পরের পরিচিত ছিলেন। খুব ভালো বন্ধুত্ব ছিল তাদের। একদিন তারা ঠিক করে এবার বিয়ে করবে আর খুব তাড়াতাড়ি তাদের সংসারে তৃতীয় জনকে নিয়ে আসবে। কারণ বিয়ের বয়স তাদের পেরিয়ে গিয়েছিল। কিছু দিনের মধ্যে তারা বিয়ে করে নিল। কিন্তু রুবেলা, যাকে পার্কার রুবি বলে ডাকে, সে মা হতে পারছে না। অনেক ডাক্তার অনেক ওষুধপত্র খেয়েও কিছু হল না। রিপোর্ট বলছে কোনো অসুবিধে নেই, দুজনেই সুস্থ। তথাপি তাদের সন্তান হচ্ছে না। হবে না বলে ডাক্তার জানান দিয়েছে। হতাশ হয়ে পড়েছে রুবি। পার্কার দেখলেন এভাবে জীবন নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না, সে রুবিকে খুব ভালোবাসে। তাকে মিথ্যা সান্তনা দেওয়া ঠিক নয়। তাদের দুজনের প্রচুর টাকা পয়সা আছে। অতএব কিছুদিন দেশ বিদেশ ঘুরে আসা যাক বরং, দেশ দেখাও হবে বেড়ানোও হবে। মনটা ভালো হবে। আগাগোড়া দুজনেই পার্টি, হইচই কম ভালোবাসত। শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবন যাপন তারা পছন্দ করত।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দুটিতে বেড়াতে বেরুলো, গন্তব্য ঠিক করা নেই। অচেনা অজানা জায়গায় তারা যাবে। তবে জঙ্গল, নদী, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু যেখানেই থাক প্রতি রবিবার তারা প্রার্থনা করার জন্য চার্চে যাবেই। আর এই মুহূর্তে রুবেলার মনে সন্তানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করাই ছিল একমাত্র কাজ। মিঃ পার্কারও একই কাজ করে চলেছেন। জঙ্গলে, পাহাড়ে, নদীর গতিপথ ধরে তারা ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটাতে লাগলো। সাথে গাড়ি থাকায় অসুবিধা হচ্ছিল না, আর সেই গাড়ি এমন ভাবে গোছানো হয়েছিল যেন একটা ছোট সংসার। রাতে ঘুমোনোর ব্যবস্থাও ছিল। এভাবে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। পথে যত মন্দির, মসজিদ, চার্চ দেখতে পেত দুজনেই দুজনের মতো করে পুত্র কামনা করত।

অনেকদিন ঘুরে বেড়িয়ে রুবেলা ক্লান্ত, পার্কারও। ঠিক হল বাড়ি ফেরার পথে তারা যাত্রা শুরু করবে। একদিন এক গভীর জঙ্গলের পথে হাঁটতে হাঁটতে তাদের সঙ্গে কিছু আদিবাসীর দেখা হল। পরনে পোশাক নেই। সারা শরীরে বিভিন্ন রঙ দিয়ে চিত্র বিচিত্র ভয়ঙ্কর ছবি আঁকা। দুজনেই বিপদের গন্ধ পেল। নারী পুরুষ উভয়ের শরীরের নিচের অংশে গাছের পাতার ঝালর ঝুলছে। হাতে পুরুষদের কাঠের তৈরি অস্ত্র, কেউ বা পাথর নিয়েছে শিকার করা জন্য। দুজন অপরিচিত মানুষ দেখে খুব খুশি তারা। সাথে সাথে ওদের হাত পা বেঁধে একটা পাথরের উঁচু জায়গায় বসিয়ে রাখল। অবাক হয়ে দুজনে দেখল একটা ছোট পাথর দিয়ে তৈরি করা গুহা দূরে। সামনে উঁচু উঁচু পাহাড় চারদিকে। মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। মাটি, পাথর, কাঠ ব্যবহার করে এরা। এরা ধাতুর ব্যবহার জানে না। গুহার ভেতর থেকে দুজন আদিবাসীকে বেরুতে ওরা দেখল, পুরো পোশাকহীন তারা। তবে মেয়েদের চুল খুব সুন্দর, আর খুব বাহারি বিনুনি তাদের মাথায়।

পার্কার আর রুবেলাকে ঘিরে সবাই নাচতে শুরু করল। চুপিসারে দুজনে ঠিক করে নিল ঘাবড়ালে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। নাচ থামছে না, দুজনেই ক্লান্ত হয়ে ঝিমোতে লাগল। একটু পরে তারা দেখল কিছু ফুল, ফল আর কয়েকটা মৃত পাখি গুহার সামনে রাখা হয়েছে। চারপাশে ধোঁয়া আর সেখান থেকে বিচ্ছিরি গন্ধ জায়গাটাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। আকস্মাৎ বিকট একটা শব্দে সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল বুঝি পাহাড়টা এবার ভেঙ্গে পড়বে। এমন সময় কোথা থেকে খুব সুন্দর একটা বাঁশির সুর ভেসে এল, সেটা সারা জঙ্গলকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক অবাক করা মায়াজাল ছড়িয়ে দিল। সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ল আর কিসব উচ্চারণ করতে লাগলো। বেশ কিছু সময় পরেই সবাই উঠে জঙ্গলের ভেতরে চলে গেল, মুখে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। জায়গাটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে, চারিদিকে অন্ধকার ঘণীভূত হতে শুরু করেছে। এবার পালাতে হবে। তার আগে গুহাটা দেখা দরকার। লতাপাতার বাঁধন কোনোরকমে খুলে তারা নেমে এল।

গুহার ভেতরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় তারা দেখল এক পুরুষ মূর্তি, যার ভুরুর মাঝখানে একটা চোখ, বেশ টানা আর বড় চোখ। করুণাময় দৃষ্টি। প্রাণ জুড়িয়ে গেল, মনটা শান্ত হল।

ভক্তি ভরে দুজনে প্রণাম জানিয়ে সেই অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে নিজেদের মনোবাসনা জানিয়ে তাড়াতাড়ি সেই স্থান ত্যাগ করে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। কিছুদিন পর রুবেলার শরীর খারাপ করায় তারা বাড়ি ফিরে এল। কয়েকদিন পর ওরা ডাক্তার দেখাতে গিয়ে জানতে পারলো রুবেলা মা হতে চলেছে। আনন্দের বন্যা বয়ে

গেল। পরিচিত সবাই খুশি। যথাসময়ে রুবেলা একটি সন্তান প্রসব করল। চারজন মানুষ ছিল লেবার রুমে। ডাক্তার, নার্স, আয়া আর মিঃ পার্কার। অচেতন রুবেলা। শিশু একদম ঠিক আছে কিন্তু তার দুই ভুরুর মাঝখানে বড় আকারের চোখ। এত অবাক কেউ হয়নি এর আগে, পার্কার ছাড়া। সেদিন সেই রুদ্ধ কক্ষে তারা শপথ নিয়েছিল এই শিশুর কথা কেউ বাইরে জানবে না। ডাক্তার পার্কারকে নির্দেশ দিলেন, ''এখানে থাকলে ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না, কষ্ট পাবে তোমরা, দূরে কোথাও চলে যাও।'' রুবেলা ছেলেকে দেখে খুশি খুব। দুদিন সময় নিয়ে বড় গাড়িতে যতটা সম্ভব জিনিসপত্র নিয়ে এক ভোরে তারা আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল। পার্কার নিজের বাড়ি প্রতিবেশীর কাছে বিক্রি করে দিয়ে অজানা পথের দিকে পা বাড়ালো। ডাক্তার বলেছিল ছেলেকে দেখাবেন না, বলবেন ওর চোখ আলো সইতে পারে না। একটু বড় হলে চোখে কালো চশমা পরিয়ে রাখবেন। টানা দুদিন গাড়ি চালিয়ে সবাই এক বিশাল পাহাড়ের কাছে এসে উপস্থিত হল, যার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর এক নদী। সেখানে তারা কাঠের বাড়ি তৈরি করে বসবাস করতে লাগলো। রুবেলা ছেলের নাম রেখেছে জিসাস।

এভাবে প্রায় নয় দশ বছর কেটে গেছে, জিসাস খুব সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েছে। ওদের বাড়িতে কোনো আয়না ছিল না। তাই সে জানত না তার মুখটা কেমন। তার বাবা মাঝে মাঝে নৌকা নিয়ে অনেক দূর থেকে বাজার করে আনত। খুব মেধাবী ছেলে, পড়াশুনা মন দিয়ে করে। পাহাড়ের দিকে যেতে তাকে নিষেধ করায় সে সেদিকে যায় না। একদিন আকাশে বিকট শব্দ শুনে জিসাস ওপরে তাকিয়ে দেখল একটা ডানাওয়ালা বিশাল পাখির মতো জিনিস উড়ছে, তার ভেতরে একজন মানুষ বসে সেটা চালাচ্ছে। লোকটা খুব সুন্দর দেখতে। জিসাস অবাক হয়ে ভাবছে লোকটা তাকে অমন করে দেখছে কেন? শব্দটা মিলিয়ে গেল। আর কয়েক মিনিট পরে সেই মানুষটা জিসাসদের বাড়িতে এসে কড়া নাড়ল। বাবা মা বেরিয়ে এলেও জিসাসকে দেখা গেল না। পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, তিনি একজন চার্চের ফাদার। জিসাসকে ডেকে অনেক লজেন্স দিলেন। তারপর বললেন, দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে, ''ওটা আগ্নেয়গিরি, বারো বছর পর ওটা জেগে ওঠে।'' কথা শেষ হবার আগেই জিসাস বলল, ''ওর ভেতরে আওয়াজ হচ্ছে।'' ''এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান'' ফাদার বললেন। ফাদার চলে গেলেন। পার্কার আর রুবি কিছু দরকারি জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। ঘণ্টা দুয়েক পরেই বোমা ফাটার মতো শব্দ আর আগুনের গোলা দেখা গেল আকাশে। আরও জোরে গাড়ি চালাতে চালাতে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। গাড়ি নিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। বাঁচতে গেলে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।

সহসা পাথরের একটা গুহা দেখে পার্কারের বুকটা কেঁপে উঠল, তার পুরোনো ঘটনা মনে পড়তেই দেখল মা ও ছেলে এদিকে আসছে। গুহার ভিতর সেই একনেত্র দেবতা। পার্কার আর তার স্ত্রী যেভাবে প্রণাম করল জিসাস কিন্তু সেই আদিবাসীদের ঢঙে প্রণাম সেরে যখন মাথা তুলল তার আর সবাইয়ের মতো দুটো চোখ। আনন্দে বাবা মায়ের কান্না আর থামে না। অবাক জিসাস। তাকে কোলে তুলে গাড়ি চালিয়ে সটান বাড়িতে ফিরে এলো। তারপর জিসাস অন্য ছেলেদের মতো জীবনযাপন করতে লাগলো।

ক বি তা মে লা

ফুসকুরি ■ শূলপাণি শর্মা

(১)
কাছের মানুষ
কাজের মানুষ
ভোট এসেছে তাই
কাছের মানুষ
দূরের ফানুস
ভোট শেষ রে, ভাই!

(২)
জীবন মানে —
প্রেফার ভোগ
হাসপাতালে —
রেফার রোগ!

(৩)
নদীর
বাঁধে বাস
চিন্তা
বারো মাস
নদীর
মেজাজ মন
ফুঁসতে
কতক্ষণ!

(৪)
এটা পুকুর
নাকি রাস্তা
যা বলে চোখ
তাই আজ তা!

(৫)
আছেন বেকার
আছেন হকার
মহামান্য হ্যাকার
তথ্য পাচার
পথটা বাঁচার
তাও কি আর একার!

(৬)
দলের ছায়ার
ঝরে নি স্বেদ
ঝরছে নেতা
দলের মেদ!

(৭)
শুনছো, অধীর
হয়ো না জোটে
দিল্লির বধির
শোনে না মোটে!

গান্ধার করোটির কারাগার স্মৃতি ■ অসীম দাস

উড়ন্ত বিমানের চাকা থেকে
টপাটপ খসে পড়ে বিপন্ন মানুষের লাশ!
ভাইরাল এ দৃশ্য চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে
ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।
কতিপয় বণিকের পুঁজি
যুদ্ধের খুলি চেটে চেটে
বারংবার আরও নধর হয়।
কমেডির দৃশ্য শেষ হলে
ইতিহাস ফিরে আসে ট্র্যাজেডির বেশে।
সম্রাট সম্রাজ্ঞীর প্রয়োজনে ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন জন্মায়।
দানা পানি পেলে বেড়ে বেড়ে
শেষে স্রষ্টাকেই গিলে খেতে চায়।
নিজেই নিজের প্রতিবাদী ভাবনা চুরি করে
বয়লারে বসে বধির সাজার ভান করি।
গান্ধারী ভুলে যায়
গান্ধার করোটির কারাগার স্মৃতি,
শীত শীত শকুনি ভোলে না!





তাঁর পাহাড় ■ মোনমাঝি মনীষা

মুখর পাহাড় দিয়েছিল তাঁকে কথা
একদিন শুধু তাঁরই পাহাড় হবে
যেদিন রাতে জ্যোৎস্নায় স্নান করে
ভালোবাসা তাঁর বৃষ্টি হয়ে যাবে

তাঁর সে পাহাড় সাগরের নিচে ঘুমিয়ে
নাম তার ''দ্য মিড ওশান রিজ''
বুকের ফাটলে গলছে আগুন তার
প্রকাশিত হবে একদিন নিশ্চিত

সেদিন কি সে এসে পাহাড়ের বুকে
মেখে নেবে তাঁর পাহাড়ী বিষণ্ণতা..?
পুড়ছে যার অন্তর এতখানি—
সে কি কোনোদিন ফিরে পাবে মুখরতা..?

তবুও কত রূপকথা মরে যায়
শব্দের সাথে নীরবতা করে আড়ি
ঔদ্ধত্যে সেই পাহাড় দাঁড়ায় একা
মেনে নিয়ে অনাকাঙ্খিত ছাড়াছাড়ি..

শিউলি ফুল পদ্ম ফুল ■ দীপান্বিতা হক

আমাদের কুয়ো তলায়, গোলাপী রঙের স্থল পদ্মের গাছ ছিল
আর, বাড়ির সামনে, ঝাপ্পুস ঝুপ্পুস এক শিউলি গাছ।
শরৎ এলেই, সন্ধ্যে থেকেই শিউলির প্রাণ আকুল করা সুগন্ধ
সে গন্ধ বাগানে, উঠোনে, ঘরে, ছাদে ও মননে বাসা বাঁধত।
আমার মা যখন ছোট্ট ছিল, উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসেন
মায়ের মা, শিউলির গোড়ার গৈরিক রঙে -
মা, মাসিদের জামা ছুপিয়ে দিতেন,
ভাবতে ভাবতে আমার চোখে এক আকাশ ঘুম।

পদ্ম খুলত ভোরের আলোর সাথে সাথে
সূর্যের রঙকে হার মানিয়ে দেওয়া সে নরম গোলাপী রঙ
সে ফুলেদের জুড়ে মুগ্ধতা একরাশ!
কোথা থেকে ভ্রমর এসে জুটতো সেই ফুলেদের ঘিরে
শিশির ভেজা সেই পদ্মেরা যেন স্বর্গোদ্যানের রানী।
ভাঁজে ভাঁজে তাদের পাপড়িদল, দুহাতের করতলময়,
কৈলাসের উমার জন্য, সাজিয়ে রাখি সেই পদ্ম আর বিল্বপত্র।



অদৃশ্য শক্তি ■ বিক্রমজিৎ ঘোষ

মনের আনাচে-কানাচে
অদৃশ্যশক্তি বারেবারে উঁকি মারে
একটা ক্লান্ত ক্ষীণ স্বর
গলা থেকে বেরিয়ে আসে
কেমন যেন মনমরা হয়ে যাই
সূর্যের আলো ক্ষীণ হয়ে আসে
আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে যায়
হৃদয়টা বাস্তবের হাতছানি পেয়ে
হৃদয়হীন হয়ে পড়ে –
আমরা ভাসি অদৃশ্যশক্তির স্রোতে।

শারদ সনেট ■ ফটিক চৌধুরী

মেঘেরা পাততাড়ি গোটালে বর্ষাশেষে
আকাশ পরতে চায় নীলাম্বরী শাড়ি
কালো মেঘ দুধ-সাদা হয় অবশেষে
কাশের বনে অপু-দুর্গা দেয় পাড়ি!

খালি পা মাড়িয়ে গেলে শিশিরের ঘাসে
নরম ছোঁয়ায় আনন্দ জাগে না খুব?
শিউলিতলার শ্বেতশুভ্র যদি হাসে
পরিযায়ী মন গভীরে দেয় যে ডুব।

সতেজ গাছ নিজে যদি হয় আনত
জানাই যদি তাকে শারদ সম্ভাষণ
ঋতুরানি নিজেই যেন অপ্রতিহত
তবুও তো তার মন হয় উচাটন।

আমরা পথিক যেন সেই পথভোলা
শারদ এসে ফি-বার দেয় মনে দোলা।



কাছে এসো ■ সঞ্জিত মণ্ডল

বৈশাখী ঝড়ে তাণ্ডব ছিলো নাকি!
বুকের পাঁজরে আঘাত হানলো কে?
দিন গোনা শেষ হয়েছে বুঝি অকালে!
বাঁধভাঙা নদী আষাঢ়ে ডোবায় কাকে!

ফাগুন দিয়েছে আগুন রঙের চিঠি
হারিয়ে ফেলেছে দরদী ফকির সেটা,
আল দিয়ে রাখি অনাবাদী যতো জমি,
জানিনা কে এসে ফসল ফলাবে সেথা।

লাঙল জোয়াল হেরে গেছে যুদ্ধেতে
কাস্তে আজও কি লড়ে যায় রাস্তায়-
অক্ষত আজও পুরানো সে বটগাছে
ঠিকানা হারানো পাখিরা বাসা বাঁধায়।

পুরানো হিসেব রক্ত রাঙানো চোখে
দাউ দাউ করে আগুন লেগেছে কোথা
যে দিশা হারিয়ে পথ ভুল করে ফেরে
শত্রু সেখানে পা দুটো মাড়ায় ব্যাথা।

ব্যাথা দিও নাকো দগদগে সেই ক্ষতে
আস্থা তবুও গলাতে আটকে আছে
কে আছো বন্ধু সুজন এসোনা কাছে
হাতে হাত রাখি সুদিনের চেষ্টাতে।

অবশেষে তুমি একা ■ বি. কে. স্বপন

এলোমেলো বাসনের মতো টুংটাং শব্দের মাঝে
অবশেষে সকলেই একা!

চাহিদার ঘষামাজা সয়ে ক্ষয়ে যায় এ শরীর
তবুও অক্লান্ত থাকা অটুট দায়বদ্ধতায়।

ঢেউয়ের ব্যস্ততা নিয়ে কাটাতে হয়েছে আজীবন।
ডেইলি রুটিনে ঘুঘুর বাসা; জড়পদার্থের মতো
স্থির, গুনে যাও আয়ুষ্কাল।

মায়া-মমতারা যেন বুড়ো গাছের ছাল-বাকল,
সব ঋণ ভুলে একসময় পাতারাও ঝরে পড়ে
নিজের সুবিধা মতো।

এমনি করেই যে যার মতো ঝরে পড়ে, সরে পড়ে
অনাকাঙ্খিত শূন্যতা চোখে অবশেষে তুমি একা....



শুভ নীড় ■ সমরেশ মণ্ডল

দুলে উঠলে, উঠবে! এ ও একধরনের নৌকা।
টলমল করে হাওয়ায়, ফিরে পায় গতিও
কখনো-সখনো উল্টে যাবার মুখে থাকে কিন্তু
মোটেও উল্টে যায় না।
আবার অবস্থার জেরে সোজা হয়, গতি পায়
ক্রমশ পাল উঁচু হয়ে ছুটতে ছুটতে বাঁকের মুখে
অদৃশ্য হয়ে যায়
তখন ঝড়কে ঝড় মনে হয়না
বাতাসকে মৃদুমন্দ বলে বোধ হয় আর
প্রবাহিত তরঙ্গ বুঝি কেবল কথার কথা
আকাশে বাতাসে ছড়ায় সুভোগ্য
মৃদু শুভ নীড় খোঁজার
অভীপ্সা।

গলাকাটা ■ আব্দুল্লাহ আল রিপন

যখন কারও মৃত্যুর কথা শুনি
মৃত্যু-পূর্ব মিনিট কয়েক তার
টের পাই নিজের ভেতর, –
হুবহু সেই মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে উঠি।
এবং প্রতিদিন যতক্ষণ
চেতনা বাঁচিয়ে জেগে থাকি
দুই একবার শুনি অন্ততঃ
মরহুমের নামাজে জানাজা...।
মরহুম শব্দটি আব্বার দুইহাত হয়ে
আমাকে পরিয়ে দেয়
মৃত্যুপথযাত্রীর শরীর। টের পাই :
বুকের ওপর উঠে থেমে আছে ট্রেন
অথবা অযথা ডুবে যাচ্ছি একা
বাতাসহীন অন্ধকারে। –
ঠিক মিনিট কয়েক!
তারপর আবার দিই দৌড়
হাত থেকে ছুটে যাওয়া
অর্ধেক গলাকাটা মোরগের মতো।



আশ্রয় ■ বৃষ্টি (পলি ঘোষ)

বুকের ভিতর জমিয়ে রেখেছি
মস্ত বড় পাথর।

আমি ভেজা সোঁদা মাটির বুকে
ওড়না পেতে
এগিয়ে চলি ভ্রুক্ষেপহীন সত্যের পথে।

ডাইরির পাতায় কলমের আঘাতে
দিন প্রতি দিন শব্দ ছড়াই আপন মনে।

হাঁটার পথে নিঃস্ব হয়ে সত্যিকারের
মানুষ খুঁজে বেড়াই।

কারো প্রতি নেই কোন অভিমান ও অভিযোগ।
শুধু আছে বুকের গহীন অরণ্যে
অনেক ক্ষত চিহ্ন।
তাই আজ এই ক্ষত কাব্য হয়ে
লিপি করে বন্দি।

বিদায় বেলা দিয়েছি সকলকে ছুটি।
প্রতি দিন শব্দ ছড়াই আপন মনে।
রোজ একবার ছুঁয়ে যাই প্রভাতের মিষ্টি হাসি।

আজ উন্মুক্ত হৃদয় জুড়ে প্রতিক্ষণে
মনের অনন্ত বেদনা পেয়েছে আশ্রয়।

বৃথা জেনো সব মায়াবী ভালোবাসা।
কি পাবে বলো এই নিঝুম শেষ রাতে
স্মৃতির পাতায় বেদনা ভরা কবির কাছে?

শেষে ফিরে যাবে আবেগহীন গন্ধ মেখে!

পথের কোণে প্রেম ফুলে ফুলে জ্বলে ■ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে হাসনুহানার সঙ্গে দেখা
সবুজ সাদা মাখানো শরীর
চোখের পাতায় স্বপ্ন মাখা
সারা মুখে আনত লজ্জা
সামনে এসে দাঁড়ালে বুকের সিন্দুক খোলে
একে একে বেরোয় তোমার তুমিরা
আমি অপলক বসে দেখি
অতীতের বিজ্ঞাপন হয়ে তোমার উথালপাথাল
তোমার নূপুরের আওয়াজে তখন পাখি ডাকে
তোমার হাসিতে ঝর্ণা ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে
তোমার চোখের তারায় খেলা করে মেঘ
সারা শরীর জুড়ে মৃগনাভির শৃঙ্গার
সেদিন হাঁটতে হাঁটতে যেই তোমাকে ছুঁই
মুহূর্তেই দেখি তুমি নীলকন্ঠ পাখি
উড়ে যাও দূরে আরো দূরে
নীলিমায় নীল সমাকীর্ণ যোগিয়া তখন



মিনু মারা গেছে ■ স্বপন নাগ

মিনু মারা গেছে
মিনু অবনের বউ
টেলিফোনে জানালো সায়ন

'চিকিৎসার সুযোগও দেয়নি
দুদিনের জ্বরেই সব শেষ –'
টেলিফোনের ওপারে
সায়নের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর।

ওপার!
টেলিফোনের এপার আর ওপার
ওপারে সায়ন, আমি এপারে।

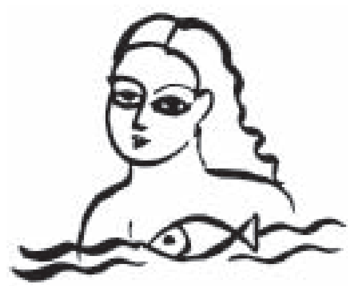
কোন্ পারে এখন মিনু?

মিনু অবনের বউ
মিনু আমার কেউ নয়;
তবু একদিন
মুঠোর পাঁচ আঙুলের
একটি আঙুল ছিল সে।

আমাদের মুঠো
ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে!

জীবন ■ নীপা চক্রবর্তী

জীবন এইরকম থাকুক
চারিদিক থাক পবিত্র, নির্মল
সরল হোক যাপিত জীবন
জাগ্রত হোক মানবিক মূল্যবোধ!
নীলের মাঝে হোক সবুজের উপনয়ন।
স্নিগ্ধ সুবাতাসে ভরে উঠুক সুচেতনা।
সত্যের প্রতি হোক সবাই দায়বদ্ধ,
বেড়ে উঠুক প্রকৃতির নিবিড়তা
উৎসাহিত হোক জীবনের সংযম শক্তি।
থাকুক চারিদিকে আবেগ অনুভূতি।
আত্মীয়তা, ভালোবাসায় বসবাস যোগ্য হোক
পৃথিবীর মূলমন্ত্র।
ফুটুক শতদল হৃদয় মন্দিরে!
প্রতিটি ভোরে হোক নুতন নুতন সূর্যোদয়
হৃদয়ের প্রান্ত আকাশে।
চাই এই রকম জীবন ...



গাইবো আবার প্রাণ ভরা গান ■ মানস চক্রবর্তী

গাইবো আবার প্রাণ ভরা গান, আঁকবো আবার ছবি
হারানো দিন ফিরে এলে পাবো ফিরে সবই।।

দূর গগনে পাখির মতো মেলবে রে মন পাখা –
ঝর্ণা-সাগর-বনবীথি আবার হবে আঁকা।
তোমার-আমার প্রেমের কথা রাখবে লিখে কবি।।

আলো মেখে ফুলকলিরা মেলবে যে তার দল –
আমার সাথে নদী আবার ছুটবে ছলাৎ ছল।

সারাবেলা মনের সুখে করবো মোরা খেলা –
আবার যদি পাই গো ফিরে সেই সে কিশোরবেলা।
তোমায়-আমায় দেখে আবার উঠবে নতুন রবি।।

সাঁওতাল নারী ■ মুরলী চৌধুরী

কালো বরণ ধামসা মাদল
লাচছে দেখো সাঁওতাল দল
নাকে নোলক, হাসছে সারি -
ওই যে দেখো সাঁওতাল নারী।
হৃদয় যে তার কোমল পরশ,
অঙ্গে যে তার ঝরছে হরষ।
উপর কালো বরণ ঘেরা,
মনটা যে তার সোনায় মোড়া।
নারী সে কি যেমন তেমন!
কাজের তালে মরদ দমন।
মাঠে ঘাটে বনে জলে,
একাই বটে কদম চলে।
ইট্ ভাটাতেও দিখ্ না কেনে,
কষ্ট তো তার কেষ্ট চেনে।
আগলে রাখে ঘরখানিরে,
পরাণ বাজি বার দুয়ারে।
পরকে হাসায় লিজে কেঁদেও
ধামসা মাদল লাচটা লেচেও।
ঝুমুর, দাশাই, টুসু গানে,
গুনগুনিয়ে প্রাণের টানে।
পায়ের তালে উড়ায় ধুলো,
সবার মনে খুশি ছুঁলো।



আয় ঘুম আয়, ঘুম ■ পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়

আকাশে অস্ত গোধুলির আলো
সাতরঙা সাঁঝবাতি
প্রদীপ সলতে, শাঁখের মন্ত্রে
বিভূষিত ভিটেমাটি

সূর্য উঠলে সুরতরঙ্গে
বাতাস ধরবে তুলি
আশাবরী ধরে রোজ এ পাড়ার
দোয়েল আর বুলবুলি

সূর্য ডুবলে চাঁদ উঠে আসে
বরণডালাটি হাতে
জোনাকিরা জ্বালে লক্ষ প্রদীপ
চাঁদ ভেজা জানালাতে

পুকুরের ঘরে জলমশারির
বাতাসের ক্যানভাসে
বাড়িঘর গুলো ডানা মেলে দেয়
মুক্তির উল্লাসে

শালের পাতায় কঙ্কণ বাজে
ঝুমঝুম ঝুমঝুম
রাতের পাখিটা ডানা ঝাপটায়
আয় ঘুম আয়, ঘুম।

এ রাত ■ অমর কুমার দাস

এ রাত
তোমার আমার জীবন পথের
স্বপ্নে দেখা রাত
মনের খোঁজে দীর্ঘদিনের
স্বপ্নে দেখা রাত

সাত পুরুষের সুখদুঃখের গোপন সংলাপ

এ রাত
তোমার আমার
জীবন পথের শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা রাত

সামলে রেখো সামলে রেখে গাও
জীবনের সেই গান

এসো পরিশুদ্ধ রজনী
পবিত্র সুখে ভাসো

এ রাত
তোমার আমার জীবনের স্বপ্নের সেই রাত



কুহকের জাল ■ অর্পিতা ঘোষ পালিত

সময়ের মুখের সাথে বারবার বদলেছে যুগ
কোনোটাই ছিলনা সুখের উচ্ছাস মাখা।
স্থায়ী হয়নি সুগন্ধ, কটু গন্ধে হয়েছে পরিবর্তিত,
আলোর রশ্মিগুলো চাপা পড়েছে গোরস্থানে।

ঘন ছায়াকে আহ্বান করে গুমোট বাতাস,
সাহসের শব্দ সংশয়ের আড়ালে।
সম্পর্ক ভাঙে, বাড়ে ঝগড়া বিবাদ,
রিফু করে কাটে জীবন।
নিঃসহায় নিশ্চুপ, রুমালে লুকোয় জলীয় বাষ্প।
নজর এড়িয়ে ধুম্র আলো মাখে কেউ...
পাতানো আঙুলে মাখামাখি মিথ্যে মীমাংসা,
অবান্তর গল্পের ডানা ঠুনকো টোকায় ঝরে পড়ে...

একবুক বৃষ্টি নিয়ে কাটে নির্জন রাতগুলো।

বৃদ্ধাশ্রম থেকে বলছি ■ অনুপ কুমার ঘোষ

বৃদ্ধাশ্রম থেকে
বলছি শোন খোকা
আমিতো খুব
তুচ্ছ আর বোকা
পারিনি তোকে
ভালো শিক্ষা দিতে
এমন মা কেউ
চায় না পৃথিবীতে।

সুখে থাকার কোন
সুপ্ত বাসনায়
টাকা তৈরির কল
খুলেছি অছিলায়
সহজ সরল শিক্ষা
পারিনিতো দিতে
জবাবটাও পেয়েছি
কেমন সমুচিতে।

খোকা তোর শরীরটা
মানুষের মতো
বাদবাকি যা আছে
পশুকে হারাতো
তাই আজ আমি
আছি বৃদ্ধাশ্রমে
বুঝেছি যে পরিনতি
মরমে মরমে।



খোকা তোকে তাই
আগে বলে যাই
তোর জন্য ভেবে
ভেবে যে ডরাই
খোকা তোরও ছেলে
হচ্ছে যে বড়
ভয় পেয়ে আমি
হই জড়সড়
প্রকৃত শিক্ষায় যেন
শিক্ষিত সে হয়
মনেতে গ্লানি আর
পাপ নাহি রয়
চায় না দেখতে তোকে
বৃদ্ধাশ্রমে যেতে
অন্তরেতে কষ্ট
আমার মতো পেতে।

অপেক্ষা ■ শাজাহান কবির

আমি আর জ্যোৎস্নার কাছে
যাই না আজকাল
জ্যোৎস্নাও আর আসে না
আমার বারান্দায়,
একটা নিকষ কালো অন্ধকার
দু'জনের মাঝে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে
আছে, বেশ কিছুদিন।

আমি এই অন্ধকারের পাঁচিল পেরিয়ে
যেতেই পারি ওপারে, অনায়াসে।
কিন্তু...
অন্ধকারে পেরোতে গিয়ে যদি
ঢুকে পড়ি আরো গভীর অন্ধকারে...
তারপর আরো গভীরে... আরো...

তার'চে অপেক্ষায় থাকি...

আলো আর আঁধারের মাঝে
ভালো করে চিনে'নি জীবনের
গলিপথ।
অমাবস্যার কালরাত্রি কেটে গেলে
আবার তো উঠবেই পূর্ণিমার চাঁদ।



অন্যমনে ■ চন্দনা দেবনাথ (দাস)

অন্যমনে থাকলে বসে
তোমায় মনে পড়ে,
আকাশ-কুসুম কল্পনা সব
জড়িয়ে এসে ধরে।

নীল আকাশটা ছাতা হয়ে
মনে সাহস দেয়।
হঠাৎ এসে বাদলা হাওয়া
স্বপ্ন কেড়ে নেয়।

অন্য মনে যখন থাকি
পাগল পাগল লাগে,
নতুন কিছু খুঁজে পেতে
অনেক ভাবনা জাগে।

কিবা পেলাম, কী হারালাম?
ভাবি একলা বসে,
স্মৃতির খাতার পাতাগুলো
ক্রমেই পড়ে খসে।

মাঝে মাঝে অন্য মনে
থাকতে ভালো লাগে,
ভুলে যাওয়া জীবন স্মৃতি
নতুন করে জাগে।

চোখ আর দেখতে পারে না ■ কার্ত্তিক মণ্ডল

চোখ আর দেখতে পারে না!
বরং না থাকলেই ভালো হতো
পাড় ভাঙার দৃশ গুলো কি ভালো লাগে,
হৃদয় চুরচুর করে প্রতিদিন।
আবাহনী না গেয়ে তুমি বিসর্জনের গান গাও কেন ...?
তোমায় বিভেদের সুর এ-ত আপ্লুত করে!
তোমার মধ্যে চেতনার বীজ মরে গেছে বুঝি
প্রভুত্ব গ্রাস করলে মানুষ রাবণ
দাম্ভিকতার স্বর্গে সিঁড়ি
ভালোবাসায় টান ধরবেই, ধরবে।

একটু আলোর পাশে এসো,
দুবাহু বিছিয়ে বুক ভরে শ্বাস নাও
দেখবে এই প্রজ্বলিত আলোক শিখা
উদ্ভাসিত করছে তোমার মন ও প্রাণ
বসন্তের কুহুতান বাজবে কানে...।

চারণ ■ সায়ন্তী হাজরা



অনন্ত অব্যক্তের সুখ খুঁজে ফিরে
মাটিতে কেটেছি আঁচড়,
প্রতি শব্দ কুহকে আকাশের গায়ে এঁকেছি
ললিত আগ্রাসনের ভীরু মেঘ,
প্রতিবার জলছবি ধুয়ে নিয়ে
দীঘির কাছে করেছি দরবার,
আবছায়া মন্দাক্রান্তা ঘোরে –

হারানো চড়ুই, খড়কুটো আগলানো স্মৃতির সংসারে,
এখনও লেগে আছে রজনীগন্ধার বিবাহ গন্ধ,
তবু আসেনি সময়।
ঘুম ভাঙ্গানিয়া কসরৎ শেষে,
ব্যর্থ প্রেম শুধু খুঁজে চলে,
কবির প্রয়াস – কাব্যনীল হাহাকার।

একদিন ■ ভগীরথ সর্দার

'তুমি' শব্দটার ভেতর একটা পাহাড় থাকে
কিছুটা সুড়ঙ্গ থাকে আর
সেই সুড়ঙ্গের শেষে একটা সবুজ বাড়ি।

এই বাড়ির বারান্দায় একদিন
ডানা পোড়া পাখিরা এসে বসেছিল
খানিকটা জল চেয়েছিল স্নানের আশায়।

একদিন সুড়ঙ্গটা বন্ধ করে দেওয়া হল
পাহাড়টাকে ভেঙে দেওয়া হল
এখন 'তুমি' শব্দটা কেবল চুপচাপ পড়ে।

ডানা পোড়া পাখির মতো।



জীবন রেখা ■ মিঠুন মণ্ডল

জন্মের মুহূর্ত থেকে
অগ্রসর হয়েছি মৃত্যুর দিকে,
অসমান্তরাল পথ ধরে চলে সময় –
কখন চড়াই কখন বা উৎরাই!
অজস্র বাধা মনকে করে দৃঢ়,
ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে
কর্মের দ্বারা নির্মিত হয়
স্থায়ীত্বে প্রাচীর।

দোষ দিয়েছি সময়কে,
দুঃসময় বলে আরোপিত করেছি
নিষ্ঠুরতার অলিন্দে।
নিজের কর্ম ও দোষ ঢাকতে
ভাগ্যের উপর করেছি দোষারোপ,
নিজের কর্মের উপর কখনোই গুরুত্ব দিইনি,
যা ছিল আমার ভুল!
প্রাধান্য দিয়েছি কেবল নিজেকে।
সকল অহংকার–, এ দেহ–,
কালের প্রবাহে মিশে যাবে মৃত্তিকায়।

হে বিধাতা –
ক্ষমা করো মোরে' ছোড়োনা এ হাত,
তুমি বিনা চারিদিকে দেখি আঁধার ঘন রাত।।

আশ্চর্য রাতের কথা ■ সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরো প্রথম রাতটি তুমি আমাকে উৎসর্গ করলে,
দ্বিতীয় রাতটি আমি তোমাকে উৎসর্গ করলাম।
তৃতীয় রাতটি কেমন একা হয়ে গেল,
উৎসর্গীকৃত না হতে পারার যন্ত্রণায় ছটফট করতে
করতে লবনাক্ত সোঁদা গন্ধের দিকে ছুটতে লাগল।

আমার বিস্মিত চোখ দেখল –
বকুল, তুমি নির্দ্বিধায় তৃতীয় রাতের কাছে
সমর্পিত হতে হতে রাতের চাঁদ হয়ে যাচ্ছ।

ধরো ওই তৃতীয় রাতেই যদি আমি তোমাকে
বোঝাতে পারি চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই
সে সূর্যের গোপন আলোয় আলোকিত,
তবে কী তুমি আমাকে সূর্য ভাবার মতো
ভুল করবে?

বকুল, এরপরও আমরা একসাথেই থাকব,
কী আশ্চর্য না?



আত্মপ্রত্যয় ■ দুলাল সুর

প্রবল প্রতিবন্ধকতা আপতিক অশুচি
দিগভ্রান্ত অনাবাসিক পাদচারী।

চারপাশে কুয়াশাময় পঙ্কিল আস্তরণ
বিবর্ণ সন্ধ্যার গুমোট বাতাবরণ।

ভয়াল বন্ধুর নির্জন নিবেশ
নিঃসঙ্গ বিমূঢ় মর্মদেশ।

গহীন আঁধারে অমিল আলোকরেখা
অবসন্ন দেহযষ্টি হিমশীতল হাত পা।

তিমিরাচ্ছন্ন কটাল ক্ষীণদৃষ্টি
অকুতোভয় চিত্তে অমোঘ জীবনীশক্তি।

অসীম আত্মপ্রত্যয় সুকুমার প্রাণহর
লৌহকঠিন ভীমনাদে রূপান্তর।

আঁচল ■ সমর সুর

নিয়ন্ত্রণ রেখা পার হয়ে মেঘ ঢুকে পড়ে
বাতাসের পরামর্শে
অনুশাসন নেই বলে
সহসা যখন বৃষ্টি নামে অলিগলি জুড়ে
তখনই ভীষণ মনে পড়ে শৈশবে এখানে ছিল বটগাছ।
অবাধ্য হাওয়ায় ভিজে যেতো ছেলেবেলা।
মনে পড়ে তোমাকে আবার মিনুপিসি, তুমি ছিলে
সকলের পিসি।
সযত্নে মুছিয়ে দিতে মাথা।
বৃষ্টিদিনে কোথাও বটগাছ দেখলেই মনে হয়
আমার শৈশব
ভিজে যাওয়া আমার সকাল।
বাড়ি ফিরে আজও গা মুছতে গেলে গামছাকেই মনে হয়
মিনুপিসি তোমার আঁচল।



আকাশে হারানো চাবি ■ অসিকার রহমান

এখানে সবকিছুই হতে পারে তোমার
আকাশ বাতাস নীল জল
মরিচীকাময় মরুস্থল
বলো তোমার ছাড়া এ সব হবে কার?

উড়ন্ত আমি করেছি বিশ্ব পরিক্রমা
বাতাসে নিয়েছি একবুক বিশ্বাস
মরু জঙ্গলে গড়েছি আবাস
যথার্থ জীবিত তবু মরে অশ্বত্থমা।

সবই জানো তুমি
একটুকরো ভিটে আমার ঘর –
ক্ষীণ বাতাস এখানে অনড়
বিস্ময় জগতে আমার অতি ক্ষুদ্র বাসভূমি .....

তাও কি তোমার বলে অসংকোচে করবে দাবি?
এ ঘরে লুকানো আকাশে হারানো চাবি!

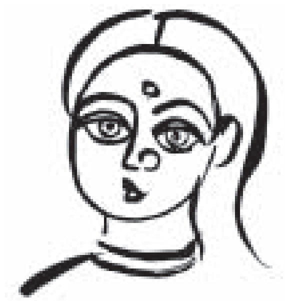
বার্ধক্য ■ দীপঙ্কর চৌধুরী

বয়স বাড়ছে বাড়তে দাও।
কেশের রঙ বদলাতে দাও।।
যতদিন করছে হৃদয় ধিক ধিক;
নতুন স্বপ্ন সাজাতে দাও।।

সময় কি থামে নাকি;
তাকে আপন মনে চলতে দাও।।
ক্লান্ত বুজে আসা চোখে;
মধুর স্মৃতি আসতে দাও।।

ছেড়ে দাও এখন ইঁদুর দৌড়;
অন্যকে আগে যেতে দাও।।
কেউ জেদ ধরে কান্নাকাটি করলে;
নিজের খেলনা দিয়ে দাও।।

রাতে ঘুম যখন আসেনা;
ছাদে খালিপা বেড়াতে দাও।।
বয়স বাড়ছে বাড়তে দাও।
কেশের রঙ বদলাতে দাও।।



পিছুটান ■ রূপক চট্টোপাধ্যায়

না, আর ফিরতে চাইনা
হারানো হরপ্পার নাগরিকত্ব হাতে।
এই স্মৃতি সান্ধ্য জলে
ভুর্জপত্রে লেখা, সংলাপের শেষ পরিচ্ছেদ
ভাসিয়েছি অকূলের নামে!

না, আর ফিরতে চাইনা
তোমাদের গাঢ় হাতছানির ছায়ায়।
আর, মাইলফলকের গণিত ধরে ধরে
রেখোনা আমার পথে
সজল শ্রাবণ মাসের
কেতকী যূথিকা জ্বেলে।

এইবার, ক্রমশ ঝাপসা হোক
গ্রামের সীমানায় ভাঙা স্কুল বাড়ি,
রাঙা মানবীর হাসি মুখ। প্রেম পাখি।

আরও ঝাপসা হোক
চন্দ্রবলী রূপের টানে
বেজে ওঠা, মোহন বাঁশীর আশাবরী!

না আর ফিরতে চাইনা
এই দূরত্বে আলোকবর্ষ থেকে
নিকটের জোনাকি কথাতে, কোনো দিন!

আততায়ী ■ ব্রততী

আসন্ন সন্ধের বুকে একটা দুটো করে জেগে উঠেছে প্রদীপের সমাহিত আলো,
গার্হস্থ্যের মঙ্গল কামনায়

বাতাসে কাঁপছে আগুনের শিখা

একটি অখণ্ড নীরবতা ঘিরে আছে আমার সমগ্র যাপন
একাকিত্ব ডালপালা বিছিয়েছে সমস্ত অন্দরমহলে

বৃষ্টির আলেখ্য থেকে ঝরে পড়ে নিষ্ফল অক্ষর
আমি ভীষণ আবেগে বারবার ভুল করে তাকে 'প্রেম' বলে ডাকি

আর ঠিক তখনই গোধূলির পড়ন্ত আলোয়
অতিকায় চিল ছোঁ মেরে তুলে নেয় নিরীহ শিকার



এখনও সময় পেলে ■ সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

এখনও সময় পেলে আকাশের তারা গুনি।

চাঁদটাকে দেখি অপলক দৃষ্টিতে
দেখি নদীর কুলকুল বয়ে চলা
শুনি জলের ছপ ছপ শব্দ।

ভরা দুপুরে শুনি বাউলের একতারার টুং টাং
কখনও কাকেদের কর্কশ 'ক্যা ক্যা' কলরব
কিংবা নির্জনতার দীর্ঘশ্বাসের নিশ্চুপ পদধ্বনি।

এখনও হয়তো বেঁচে আছি আমি
তাই গাছেদের ফিসফিসানি শুনি
দেখি মানুষের হানাহানি আর রক্তপাত।

এখনও সময় পেলে অপেক্ষায় থাকি আমি
জানি সেই গাড়িটা একদিন আসবেই
যাতে চড়ে আমি চলে যাবো সময়হীন দেশে।

মুক্ত জীবন, তবুও নাট্যশালা ■ অলোক শ্রীমানী

ও 'মন' কেন রে তুই
স্বপ্ন দেখিস বারে বারে,
ছবি হয়ে স্বপ্ন গুলো
উঠতো যদি ছন্দে ভ'রে।
তাহলে কি মন্দ হোত?
আঁকলে ছবি হৃদয় ছুঁতো,
মুক্ত জীবন, তবুও নাট্যশালা
ঠিক যেন 'মন' আমার মতো।
রিক্ত হয়েও সিক্ত হ'লে
স্বপ্ন বিভোর মনটা পেতো,
যুক্তি গুলো মুক্তি পেলে
হৃদয় ভ'রে শান্তি দিতো।
আ-প্রাণের প্রাণ না রয় হেথা
মন' কেন তুই স্বপ্ন দেখিস্,
ভাবের ঘ'রেই করলে চুরি
মুক্ত জীবন, খুঁজে পেতিস্।



তালাক ■ বৈদ্যনাথ ধাড়া

শাক খেতে ভালোবাসো বলেই তো
কত যত্ন করে রাঁধতুম তোমার পছন্দ ব্যাঞ্জন।
আমায় ছাড়া একপলও থাকতে পারতে না,
তাইতো কাছে কাছে জড়িয়ে রইলুম এতগুলো বছর।
সুখে দুখে সরু কাস্তের মতো কত চাঁদ চলে গেছে
ফুটো চালের ভেতর উঁকি দিয়ে।
এতগুলো বসন্তের পর কি
শুধু একটা বাক্যে
এ ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করা যায়?

থাকতে পারবে একা একা?
হাত পুড়িয়ে রাঁধতে পারবে দু মুঠো?
ঘুমুতে পারবে আমায় না দেখে?

আমি আর পারি না বাপু!
এই বয়সে অন্যের কাছে কটা রাত কাটিয়ে,
আবার কোন মুখে ফিরব তোমার কাছে।
ছেলে পুলে, নাতি নাতনি, ছি! ছি!
মুখ দেখাই কেমনে!

শুনে রাখো –
আমি মানি না তোমার ধর্মের বিধান।

ট্রয়লাস ■ ধ্রুব বসু

ভালবাসার স্বপ্নালু শিহরণের মতো
অষ্টমীর চাঁদের গায়ে
লেগে থাকা জ্যোৎস্না,
একটা প্রজাপতি উড়ে এসে
বসলো সেই চাঁদের বুকে।
চাঁদ জিজ্ঞেস করলো, ‘‘কে তুমি?’’
‘‘আমি নীরব হৃদয়,’’ প্রজাপতি বললো।

সেই সফেন জ্যোৎস্নায় তাদের বাসরশয্যা-
নিচে পৃথিবীতে
একটি নয়নতারা ফুল
তখনও জেগে আছে প্রজাপতির প্রতীক্ষায়।
চাঁদ জিজ্ঞেস করলো, ‘‘কে তুমি?’’
‘‘আমি কবির হৃদয়,’’ সে বলল।



প্রবাসী জীবনের আগুন ■ সুবীর ঘোষ

আমার মন খারাপের দিনে তারারা কাঁপে।
আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্বসংসার অভুক্ত থাকে।
বর্ণময় মেঘের বিকেল অস্তিত্ব হারায় অন্ধকারে।
প্রবাসী জীবনের আগুন জ্বলতে থাকে সর্বক্ষণ।
ধানরঙা জমিতে কত রক্তপাত দেখেছি সেদিন –
হারিয়ে যাবার ভয়ে শালিকের ভয়-পাওয়া কান্নায়
কখন ভরিয়ে দিয়েছি চারদিক
দর্শক জনতারও স্মরণে আসে না।

পাথরবেষ্টিত রাত্রি, দিন এলে ক্ষতচিহ্ন বাড়ে,
অশান্ত মনের তীরে নোঙর পায় না নাবিকেরা
হতমান বণিক তবু যেন একবার শেষ চেষ্টা করে;
বাণিজ্যবিফল তরী–তীরভাঙা ঢেউ–সুরহীন গান।

আমার মন খারাপের দিনে কবিতাও কাঁদে।
চিত্রমালা স্থির হয়ে ঝোলে।

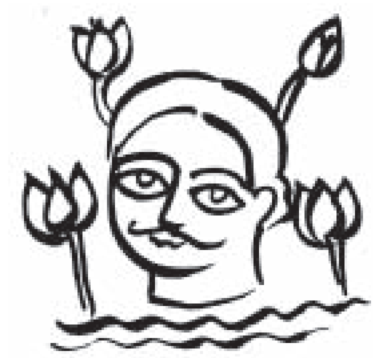
শব্দ আর আমি ■ অষ্টপদ মালিক

সাদা পাতার উপর
যেসব শব্দ নির্মাণ করেছিলাম
আজ তার বুকে
শত শত ক্ষত চিহ্ন।

শব্দগুলি সারি সারি
উঠে আসে
পৃথিবীর দগ্ধ বুকে।

শব্দ আর আমি
একসাথে মিশে যাই।

এখন আমরা হেঁটে যাই
অন্ধকারের বুক চিরে
এক চিলতে আলোর সন্ধানে।



স্বপ্ন ■ স্বাগতা ভট্টাচার্য

সদয় ফুটপাতে ঘুমিয়ে পড়ে চোখ
জলপট্টি দিয়ে, পরিচ্ছন্নহীন ডানার আড়ালে,
আকাশের প্রশ্রয়ে বেঁচে থাকে
ব্যক্তিগত সম্পর্কের কুটিল ভ্রূকুঠি।
যেন রুদ্ধ জেলের কোন আসামী
উদর ভরছে, আমার যন্ত্রণার রিখটারে
লবণ আর পান্তাভাতে।
আমার চোখের নীচে যে কালো চত্বর
সেটা খারিজ হয়ে যাওয়া শেষ
রাতের স্বপ্ন চত্বর।
উঠোনের রোদটুকু চুরি করে
ফিরে যায় স্বপ্নের অনাত্মীয়
ফেরিওয়ালারা শোক ও দ্বিধায়।
শ্বাসরূদ্ধ ছায়া ফেলে মেঘ
উন্মত্ত হাওয়ার অহংকারে
আঁচড় কাঁটা বৃষ্টিতে সমস্ত শহর
আজ একা ভিজছে।।

অবান্তর পাগলামি ■ দীপ কুমার

হুকুম মেনে পথ হেঁটে চলেছি গিরিখাতের গা বরাবর, উচিত অনুচিতকে পরওয়া না করে গুরুদুম্বার লেকের শীতল বাতাসে ওল্ড মঙ্ক আর পর্ক সহযোগে একের পর এক আইসোটপ-এর বাহানা দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন। এ খাদ এক মায়াজাল, একশো দুই ফারেনহাইট-এ যখন চোখের সামনে জোনাকি পোকা ওড়ে আর আমি ভাবি ওই টিম টিম করে জ্বলছে আমাদের প্রেমের নূর, ঠিক তখন আমার ঠোঁটে স্ফীত চুম্বন এঁকে দিও প্রিয়তমা। সিল্ক রুটের কিনারায় দাঁড়িয়ে যখন ভাবি, অনুভব করার চেষ্টা করি তোমার শেষ ছোঁয়া। নাহ সে ছোঁয়া যৌনতার নয়, আমাকে ফিরিয়ে আনার। অপ্লুত ও ব্যগ্র হয়ে উঠি তোমায় দেখার লোভে। শর্মিলা, তুমি হয়তো জানোনা ''এই বেঁচে থাকাটাই আজকে কতটা বিলাসিতা''।

কাজল কালো চোখ, গালের টোল, ওই স্ফুরণ হাসি। হেম সেলাই করা তোমার ম্যাগি হাতা ব্লাউস। পাট পাট করে কুচি দিয়ে পরা তোমার শাড়ি, যখন তুমি স্নান সেরে ধূপধুনো দাও ঠাকুরকে, ঠিক তখন তোমার গায়ের যে প্রেম প্রেম গন্ধ, ওটা বজায় রেখো। অফিস যাওয়ার প্রাক্কালে ঠিক যেমন পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরো আর আলতো করে বুকে মাথা রেখে বলো, ''জলদি ফিরো'', আমি হাজার হাজার ফুট গর্তে ঝাঁপ মারি তোমার স্মৃতি নিয়ে। এটাও কন্টিনিউ কোরো, কেয়া পাতা কাল হো না হো।

এ জীবন বড়ই কঠিন প্রিয়। কে কখন কার অঙ্গীকার ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয় কেউ জানেনা, স্বয়ং খোদাও নয়। তাই সব দেখাই শেষ দেখা, সব ছোঁয়াই শেষ ছোঁয়া, সব অভিমান শেষ অভিমান ..... এই লেনদেনে যেন কোনো ফাঁকি না থাকে। প্রতিটি সেকেণ্ডে বিশ্বযুদ্ধ চলছে এই দুপয়সার জীবন নিয়ে, জিততে জিততে কোনো এক সন্ধিক্ষণে হারিয়ে যেতে পারি, বিলীন হয়ে যেতে পারি না জানার দেশে। তুমিও পারো, পারো বৈকি আলবাৎ পারো। আনপ্রেডিকটেবল যজ্ঞ চলছে, ফি বছর নিজেদের মৃত্যুবার্ষিকীতে অজান্তেই নেশা করছি।

খবর রেখেছো? আজকাল ইউক্যালিপটশের বাজার দর বেড়েছে। আসতে আসতে গুল্ম বৃক্ষে নজর পড়েছে আমাদের, ''ছোটো হলেও পোক্ত ও অনুচ্ছেদ্য''। যেকোনো গাছের কোটরে মুণ্ডু ঢুকিয়ে বাঁচতে চাই প্রিয়, তোমাকেও বাঁচাতে চাই। স্বয়ং প্রভুর পরামর্শে টিকিয়ে রেখেছি এই শ্বাস প্রশ্বাস, তাও যদি না বলে কোনোদিন অবিসন্ধিহীন ভাবে থেমে যায় এই বায়োলজিক্যাল ক্যালকুলেশন, ক্ষমা করে দিও আমায়।

সব চুমুতেই যেন শেষ চুমুর গন্ধ লেগে থাকে।।

চাওয়া ■ দেবাশিস পাড়ুই

যেদিন তোমাকে বৃষ্টির গুঁড়ো মাখাতে ইচ্ছে হলো
খুব, ঠোঁটে-মুখে-বুকে।
সেদিন গনগনে মন পোড়ানো রোদ।

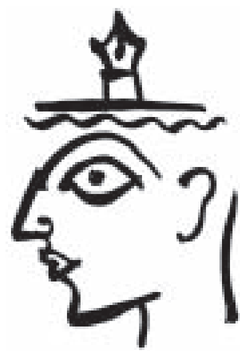
যেদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না মাখিয়ে,
শিশিরের শব্দ শুনবো ভাবলাম,
সেদিন চাঁদ খেকো অমাবস্যা।

'আয় বৃষ্টি' বলে যখন ডেকে চলেছি অবিরাম,
দুহাত বাড়িয়ে ভেজাবো তোমায়,
সেদিন মেঘ উড়ে যায় সাহারায়।

নদীর শরীরের গন্ধ মেখে,
নতুন করে জেগে উঠবো ভাবছি,
নৌকাটা হারিয়ে যায় কুয়াশায়।

আঁধারে ডুবে চুপি চুপি চলে যাব,
অজানার দেশে।
হঠাৎ মেঘ সরিয়ে চাঁদ ওঠে হেসে।

আমার চাওয়া অধরাই থাকে,
কেবলই মিলিয়ে যায় হাওয়ায় হাওয়ায়।
ফেরে না কখনও।



প্রসঙ্গত ■ মারুফুল আলম

দু'হাত উচিয়ে আছে খররৌদ্র প্রখর দুপুর।

ক্রমাগত এই দৃশ্যবোধ – নৈঃশব্দের সিঁড়ি ভেঙে
অলৌকিক স্তব্ধতায় উঠে আসে তীব্র আকস্মিক

প্রসঙ্গত, জলের গভীরে তার প্রতিবিম্বে দেখি ঃ
আকাশের মানচিত্রে খসে পড়ে মেঘের পালক!

সবটা যখন কলমের দায় ■ অমৃতা বিশ্বাস সরকার

পাচ্ছি খানিক পুজোর গন্ধ,
বাতাস মাখছে ঢাকের সুর।
কাশের তালে বয়ে যায় বেলা,
হুল্লোড় নাচে তুলোয় মোড়া অচিনপুর।
সেই আনন্দে ঘুণ ধরেছে,
পেটের ভেতর রুজির টান।
ভীড়ের বাজার অনেক ফাঁকা,
স্ট্যাটাস জুড়ে লোক দেখানি পুণ্য দান।
উথলে পড়বে কয়েকটা দিন
কোটি-কোটির সজ্জা বিহার।
পথে-ঘাটে ছিন্ন জামায়
দেবশিশু ঘুরছে যে কার?
আচ্ছা জ্বালা! বলি তাতে হয়েছেটা কী?
এতো আর নতুন নয়।
বছর বছর চলে এমন-ই।
ভীড়ের ঠেলায় বয়েই যায় সব,
টিকে যায় কিছু- অল্প।
কদিন বাদেই সব ফুরিয়ে আবার
পরের বছরের গল্প।।
কোনোকিছুতেই নেই আপত্তি।
চলছে যেমন চলুক।
হাবাগোবার শত্রু নেই,
তবে কলম কথা বলুক।।



ঋতুমতী ■ গুরুশরণ ব্যানার্জী

মাতৃত্বের আহ্বান বাণী শুনি!
মৃতপ্রায় তটিনীর বুকে
স্পন্দিত জীবনের ধ্বনি...!

দুর্বার রবিতেজ শেষে
এসেছে কিশোরী আষাঢ়
সিঞ্চিত ঋতুমতী বেশে...!

দেহ আজ পূর্ণ কলস।
এসেছে সবুজ সন্তান
বুকে তার বাৎসল্য রস...!

বিরহ ■ সুজয় মজুমদার

যদি বৃষ্টির গান শুনে
থমকে শ্রাবণ
রিমঝিম সুরে মাতে,
দুচোখে ঝর্ণা ধারা
কপোল বেয়ে
বুকটা ফাটে।

মন ময়ূরীর নাচ
থেমে গেছে আজ
এই শান্ত দিনে,
মিলনের স্মৃতি
জ্বালায় আগুন
বিরহী মনে।



লেখা ■ সজল কুমার টিকাদার

গাছেদের উপর গাছেদের কথা লেখা আছে।
আকাশে আকাশে আলোর অক্ষর ছড়ানো।
নদীও জলের আঁচলে লিখছে ঢেউ ঢেউ
কিংবা সমস্ত পৃথিবীতে, পৃথিবীর কথা....

শুধু তোমার মুখে তুমি লেখা নেই
সেখানে কেবল মেঘের বারতা!

ফেরা ■ অমিতাভ সরকার

আসলে ভাবনা বেলা অসময়
রাত্রি অধরা ছবি দ্বিমেরু
এপিটাফে স্মৃতি ঘ্রাণ ইতিহাস
জেগে রূপ চোখ ভাষ কলতান।

জীবন মাটির ধোঁয়া রাঙানি
রাস্তা হারিয়ে ফেরে অসহায়
চিরতরে একেলার অভিমান
মেঘ জমা রোদ রাগ কতকাল

ফেরারি আবেগী ছুটি মেঘ আওয়াজ
পথ চলা দূর মন খুঁজে যায়
বালিয়াড়ি জীবনের ধূ ধূ মাঠ;
কবিতারা ফিরে আসে এভাবেও।

নষ্টমেয়ে ■ অমিত দাস

ওরা বলেছিল নষ্ট মেয়ে-
আঁধার গলির নষ্ট বাতাস
বীজ বুনেছে ওর শরীরে।

অথচ
তুমি ছুঁয়ে দেবার পর
আমি এক আকাশ প্রদীপ হয়ে আছি।

প্রদীপের নীচে যত ঘনিষ্ঠ আঁধার
সে আমার প্রেম
প্রদীপের আকাশ জুড়ে যত বিকীর্ণ আলো
সে আমার ভালোবাসা।



দান ■ প্রশান্ত কুমার মণ্ডল

তাঁর যা দেবার সেখানে নেই লুকোচুরি
তাঁকে লাভ করে বড় কষ্টে সাহসী রোদ
যশ খ্যাতি সেতো তোমার নিজস্ব আলো
পথে দুপাশে পড়ে আছে সব সুন্দর
তুমি বিলাও মানুষের ভিতর
তোমার প্রকাশ মনুষ্যত্বে।

অন্ধ ভিখারি ফুটপাতে বসে খোঁজে তোমাকে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলা চাষি হাতড়ায়
গামছা পরা হাভাতে মানুষটাও
কেউ গড়ে ইতিহাস, কেউ দেয় ধিক্কার
তাঁরই দান নিয়ে এভাবে পথ চলা।
চিরকাল পথ চেয়ে থাকে তোমার দিকে
শুধু তোমার মুখ চেয়ে। দাও সে দান।



কলটাইমহীন দুপুর ■ সম্পা পাল

টাইমলাইন অনুযায়ী এখন সকাল
তারপর বন্ধ ঘড়ির কাঁটা



আশেপাশে প্রথম শরতের রোদ
হাওয়ায় ভীষণ নেশা।
অচেনা পারফিউমের গন্ধে এগিয়ে যেতে চায় জীবন

তারপর কলটাইমহীন দুপুরে বি. এড এর বছর।
যদি ফিরে যাওয়া যেত...
শুভজিৎ যদি বলা যেত 'জীবন তুমি নেশা'...

পারিজাত ■ অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়



আমার চারপাশে ছড়িয়ে যেন অনন্ত গ্যালাক্সি
তার মধ্যে আমি যেন এক গ্যালাক্সি এর ভেতর
অবিরত ঘুরছি আনন্দে, বিষণ্ণতায়
আমার অনন্ত অন্বেষণে রয়েছে
এক অজানা পারিজাত
যা একটা সম্পর্ক, অনেকটা বৃত্তের মতো
কি ভাবে সেটা বৃত্তের জ্যায়ের মতন হয়ে গিয়ে
একটা বক্র রেখায় ছড়িয়ে
কয়েকটা বিন্দুতে মিলিয়ে গিয়ে
অজানা আকাশ পথ ধরে চলে গেল....
এখন আমার পা গড়ায় এক অনিত্যের দিকে
তবুও আমি যেন আমার ছোট ঘরে
একা একটা আরাম কেদারায়
দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড, দেখি তারাদের ভালবাসা
হঠাৎ মধ্য আকাশে এসে যায় কসমিক ওয়েভ
বিবিধ বর্ণের রঙিন কণার অপূর্ব সমাহার
আমি বিস্ময়ে আকাশ পথে দৃষ্টি রেখে
চোখ মেলে খুঁজতে থাকি পারিজাত
তারপর নিঃসীম শূন্যকার ভেতর যেন চলে যাই...

শ্মশানের কবিতা-২৩ ■ স্বপন শর্মা

একটা দুঃস্বপ্নে দেখি আবহমানের তীরে দাঁড়িয়ে আমি, মা যেন বুদবুদ থেকে
উঠে আসা এক ছায়াবিন্দু। সাকার ছায়া তীর থেকে উঁচু নীচু পথ ধরে চলে।
চলতে চলতে হঠাৎ দূরের ছায়াপথে মিশে গেলেন।

করুণ বাস্তবে তাঁর সাকার শরীরে দেখেছি প্রতিটি দিনের ঘাম, হৃদয়
রক্তাক্ত, অপ্রাপ্তি সত্ত্বেও সর্বদা আলোকিত মুখ। তিনি যেন এক গাছ,
অভাবী শেকড় থেকে আটটি সন্তানকে বিলিয়েছেন আগুন, সবুজের বীজ, মাথা উঁচু
রাখার কৌশল, আর অন্যকে ছায়াদানের জন্য আকাশের মতো হৃদয়।

যখন জানলাম তিনি বাল্যবিবাহের শিকার, সময়ের টুটি চেপে ধরে বলেছি আমাকে
বিবর্ণ অতীতে নিয়ে চলো, আমি হব পিতা সেই কিশোরীর, মাতৃহারা যার
বিদ্যালাভের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার, অভাবী শরীর রোগগ্রস্ত, বিবাহের জন্য
অপ্রস্তুত শরীর ও মন, প্রথম সন্তান যার পৃথিবীর আলো দেখেনি। সময় আমাকে
পাল্টা থাপ্পড়ে বর্তমানের এক চাঁদের কাছে নিয়ে যায়।

সেই চাঁদের দেওয়া আগুনে যজ্ঞ করি আবিষ্কারের, নিজেকে ছড়িয়ে দিই দিকে দিকে।
প্রতিটি দিক থেকে শুনি আমার উদযাপন মন্ত্র। এর ফাঁকে ছায়াপথের আবাহন
করি। মনের দরজায় ডেকে আনি মেঘ সারাটা বছর।

নিখোঁজ হবো ■ অঞ্জনা চক্রবর্তী

চেনার ভিড়ে বড্ডো ভারি,
ব্যাথাতুর দগ্ধ শরীর মন,
দিনযাপনের দায়িত্ব দায়ভার
জমতে জমতে যেন আগ্নেয়গিরির রূপ ধারণ;
লাভা বেরোয়.. বুকে হল্কা – শ্বাসটা হয় রোধ
মন বলে, হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে
হারিয়ে যাই অজানা সন্ধানে.. খানিকটা জীবনেরই ঋণ শোধ।
ভালো কে না তা থাকতে চায়...
তা হোক না বাস্তব ছাড়িয়ে
খানিক কল্পনা রাজ্য বা অতীতটাকে টেনে।
হারিয়ে যায় গোলকধাম।

ডক ■ শচীন কর্মকার

পড়ন্ত বিকেল, রোদ্দুর প্রান্তর
জড়িয়ে থাকে স্বাদহীন স্বপ্নের
হাতছানি,
বলেছিলে, প্রান্তর শেষে
হেঁটে যাবো দিক মহিমায়,
ক্লান্ত অবশ দেহে ছড়িয়ে দেবে
নিরবিচ্ছিন্ন হাতের মায়া।।
ছড়িয়ে দিতে এক টুকরো
নীলনদের বারিপ্রবাহ,
রুক্ষ কেশে, নয়নের দেশে
রয়েই গেল সেই না পাওয়া
প্রতিশ্রুতি,
ভীষণ ভাবে দুলে ওই
নগর জীবনের ছায়া ভরা শ্বাস।
শ্বাসে আজ বিষ প্রয়োগে
এক রুদ্ধদ্বারের অভিরুচি।
নিথর বনানীর প্রখর প্রদেশে
হয়েছিলো আস্বাদনের প্রতীক।
সেই মুখ কবে হয়েছে শেষ
রয়েছে শুধু মায়াবী বেশ।।
আমি প্রান্তর, আমি যুগ মহিমা,
আমিই সেই অনুরক্ত অচেতন দেহ,
আমিই সেই সিন্ধুর নিরলস পান্থ
যার খোঁজ রাখে না কেহ।



বিশ্বাস নেই ■ কেয়া মৈত্র

পৃথিবীতে আর বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস
শ্বাস আছে তবু নিঃশ্বাস নেই, পরিহাস।
চেনা মুখ আজ, চেনা চেনা অবয়ব
বিবেকের কাঁধে ভর করা যেন চলন্ত শব,
মুখের আড়ালে মুখোশটা আজ জ্বলজ্বল
মধু চুরি হয়ে গেছে অবশেষে শুধু হলাহল।
বিধাতা এখন দিয়েছেন খিল দুয়ারে
কী দায় আর্তে, মরে যাক ওরা অনাহারে।
এ ধরণী কার, আর বিশ্বাস নেই,
তুমি এগোলে খুন হতে হবে তোমাকেই।

‘ও বাতাস’ তুমি কানে কানে বলো ■ বিদিশা চট্টোপাধ্যায় (আলো)

‘ও বাতাস’
তুমি কানে কানে বলো –
‘সে’ ভালো আছে;
সেতুর ওপাশটাতে, এখনো অস্পষ্টতা,
মৃত্যুর মতো কালো-ছাই,
ওড়াউড়ি করে;
নুয়ে পড়া সম্ভাবনার ফাঁকে,
শব্দে ঢালি রঙ,
কান পেতে শুনি, বাতাসের ভাষা।

‘ও বাতাস’
তুমি কানে কানে বলো –
সে ভালো আছে;
সেতুর ওপাশটাতে এখনো আঁধার,
দুঃসময়ের অন্তিম চিহ্ন-
বয়ে বেড়ায়;
নৈঃশব্দের, জীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে,
বাতাসের আনাগোনা দেখি;
কান পেতে শুনি, বাতাসের ভাষা।

‘ও বাতাস’
তুমি কানে কানে বলো –
‘সে’ ভালো আছে।



মরুতীর্থ ■ সুব্রত মাইতি

এদশক ভরসার রক্ত সঞ্চালন হৃৎপিণ্ডে
আপনজন আত্মীয় কতদূর গেলে সূর্যোদয় দেখা যায় -
জমে থাকা গচ্ছিত শব্দ রেণু সযত্নে অমাবস্যা
মগ্নতা ডুবে গেলে চোখের পাতায় কাজল
দশটা বর্ষা দশটা বসন্ত নিজের মতো উজ্জ্বল
কত সহজে সবুজ স্মৃতিগুলো মাড়াতে একটুও কাঁপল না পা..
রাস্তার ধুলো মিশে যায় অশ্রু কণা উল্কার মতো উবে গেল কথামালা।

ফিরদৌস তোমাকে ■ স্বরূপ সিংহ রায়

তোমাকে এখনো ভালো করে দেখা হয়ে ওঠেনি
তোমাকে এখনো ভালো করে ছোঁয়াও হয় নি।

এ অভিমান, এ যন্ত্রণা-লব্ধ পিপাসা
তাড়িয়ে ফেরে রোজ –

তোমার প্রথম দেখা বছর দশেকের
হাফপ্যান্টের সাথে,
আমারও প্রথম সন্দেশ-স্মৃতি সেটাই।

তারপর বড় হতে হতে ঘুরে আসা
গোঁসাইপুর থেকে গ্যাংটক,
প্রতিটি ছোঁয়ার তখন ভূস্বর্গ-স্বাদ।
প্রতিটি কচুপাতা হোগলা-বন নেশা
আর সর্বজয়ার পাঁচালি পথের প্রতিটি বাঁকে
প্রতিটি পাতায় আগন্তুক হাতছানি।

এ শরীর এই মন ভ্রমণ-কৌতুকে রেখে
প্রতিদিন হারিয়ে যাওয়া তোমার আনন্দ-ধাঁধায়।

আজও প্রায়ান্ধকারে আকাশে
আসন্ন সায়াহ্ন জুড়ে
চিকন আলোর মতো উঠে আসো তুমি

''গর ফিরদৌস বর রুহে জমীনঅস্ত,
হামিনস্তু হামিনস্তু —''

তোমাকে তবুও এখনো ভালো করে ছোঁওয়া হয়ে ওঠেনি।



করোনা যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ
স্বমহিমায় ভাস্বর

– অমর কুমার দাস, কাকদ্বীপ

আঘনে ফুল ফুটে ■ চিরঞ্জিত ভাণ্ডারী

সোনার মতন রঙ ধরেছে বাইদ বহালের মাঠে
খামার খইলা বাগায় লে বউ গবরের ছুছ ঝাটে।
কদাল দিয়ে চাছব খাবার চুমু তাড়ির ভাড়ে
জড়া শালিখ লটরপটর ঐ বাঁশবাগানের ঝাড়ে।
কামার ঘরে চললাম এখন, কাস্তা পাঁজাই আনি
পরশু থাক্যে লাগব্য ধানে বুঝলি পানের রাণি।
হঁ গো হঁ বুঝলম সবই মনে ফুটছে ফুলের কুড়ি
তুর পিরিতে মজে পদে ঠেলছি ভাতের হাঁড়ি।
তুই যে মুর রসিক লাগর কাছ ছাড়িস না কভু
চোখের উপর চোখটি রাখ আশ মিটেনা তবু।
আড়বাঁশিটয় সুরট ভরে প্রেমেতে চিকন কালা
মরণ আলে দিসগো গলায় মহুল ফুলের মালা।
এমন কথা বলিশ না বউ মনে ভীষণ লাগে ব্যথা
চোখে দেখি সরষে ফুলট ঠিক থাকে না মাথা।
মনেতে হয় মাটি দুভাগ হলে সিমায় দিবো আমি
জীবন খাতার পাতায় জানি পিরিতফুলটয় দামী।
রঙ বুঝে না মরদ আমার ফেসফেসায়ে কাঁদে
দাও না দেখি ফুলফিতাতে চুলটা আমার বাঁধে।
কালকে রাতে নেংটি ছা ট ঢোল দিয়েছে কাট্যে
আনবে সারাই পয়সা আছে লাল শাড়িটর খুঁট্যে।
ঠিক আছে একটুকদু হাসতো দেখি নয়ন ভরে
সেই কখন থেকে দেখব বলে মনটা অছে খরে।
লিজের বউর পেরেমট ভোরের আলোর ছিটা
খেঁজুর গাছের টাটকা তাড়ি বেদম লাগে মিঠা।
মানতে হবেক মরদ বটিস, হাসে পেটট যাচ্ছে ছিঁড়ে
তাড়ি গিলে গত বছর পড়েছিলে শ্যাম নগরের হিড়ে।
লেশার চোটে জাপটে ধরে রাতট দিলে মাতায়
সোহাগ করে বলবে হেসে লুপূর দিব গড়ায়।
আর কটাদিন ধরনা শবুর ঘরে আসুক ধান
আনে দিব কানের দুল আর মিঠা পাতির পান।
সুখট আনে বাঁধে দিব তোর নীলশাড়িটার খুট্যে
ফাগুন মাসট যেমন তেমন মুদের আঘনে ফুল ফুটে।
গরুর গাড়ি জুড়ে দিলম তুই যাবি গো সঙে

মনট মুর হুদকে উঠে তুর পিরিত রঙে।
বেশ করব বেশ করব তুই যে আমার পরাণ
ভালোবাসার বলব কথা কাটব যুতাই ধান।
যাতে যাতে জল খাব ঐ শালুক ফুটা ঘাটে
চাল সিজাতে কাঁচা লঙ্কা পিয়াজ লিব কুট্যে।
কাজকম্ম বাখায় লিয়ে ফিরব সাঁজের বেলায়
শাখটা ফুঁকে তুলসি তলায় প্রিদিম দিব জ্বালায়।
চাঁদের আলোয় উঠান জুড়ে ভরবে মহুল ফুলে
পিরিত লেশায় মাতাল হয়ে তোর আঁখিটর কূলে।
হঁ গ হ আমি তখন আড়বাঁশিতে সুরট দিব জুড়ে
মাদল তালে লাচবি বেদম নতটি লাড়ে লাড়ে।
এমন করে সারাট জীবন থাবব প্রেম সুহাগে চিটে
ফাগুন মাসট যেমন তেমন মুদের আঘনেও ফুল ফুটে।



পান্তাভাত ■ রাহগীর

বয়স সাতাত্তর ছুঁইছুঁই,
এখন আমি সংসারের ভাঙাকুলো।
নেই কোনো অর্থ, নেই কোনো স্বার্থ,
কেউ ঘেঁষেনা পাশে!
পুরোনো স্মৃতিই নিত্য সাথি,
তাই নিয়েই বেশ আছি!
কখনো কাঁদি, কখনো হাসি।
মনে পড়ে –
প্রতি সকালে মায়ের দেওয়া
ভাদুই ধানের পান্তাভাত,
তাই খেয়েই বোঝা মাথায়
ছুটে চলেছি ঘুঁত্ ঘুঁত্ করে।
সেই ভাদুই ধান আর নেই।
আমার মতনই –
পান্তাভাতের কদরও আর নেই।

নিয়তির খেলা ■ শ্যামলী বালা (বিশ্বাস)

আসলে ভবে যেতে হবে
পৃথিবীর মায়া ছেড়ে,
হাতে গোনা দিন ক্রমে হয় ক্ষীণ
দিয়ে সবি নেয় কেড়ে।

হোক যত গাড়ি বড়ো ভিটে বাড়ি
দু'দিনের খেলা শেষে,
তুড়িমেরে সব ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠাবে অচিন দেশে।

মায়াময় ধরা মিছে সব করা
আমার আমার বলে,
কি নিয়ে এসেছো ওগো তুমি সাথে
কী ফেলে যাবে চলে?

ঘুড়ির লাটাই তাঁর কাছে আছে
অবাধে ঘুরছি মোরা,
নিয়তির খেলা ফুরাবে যে বেলা
শেষ হবে শেষ ঘোরা।

মান অভিমান সব তাঁর দান
হিসাবের খাতা খোলা,
সময় থাকতে সব সঁপে দিয়ে
হও গো আত্মভোলা।



লিখে রাখা সুখ ■ প্রবীর দাস

মেঘ-রং সকালের আকাশ ফুঁড়ে দমকা হাওয়া
সমস্ত বন্ধ জানালা হেসে উঠে খুলে গেল
খোলা দরজা থেকে যতদূর চোখ, শুধু আলো...
কারও এই বার্ধক্যের কোণঠোসা একপেশে জীবন
মনে হয় আজীবন অতলে ডুবেছে
কেন যে জন্ম হল, কেন এই খেলা
সাঁতার না-শেখা, এ এক ভীষণ অসুখ –
নিরাময় গান 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে'...

তাকিয়ে থাকতে থাকতে গাছেদের মাথায় পাখি
ঘাসের ডগায় মুক্তোর মতো শিশির
দূরে দূরে ছবির মতন সেজে থাকা ঘরবাড়ি –
তোমরা না জানলেও নিরন্ধ্র অন্ধকার জানে
অনন্ত ভ্রমণের ফাঁকে গৃহকোণে লুকোনো সুখ
অতএব লিখে রাখে সকলেই সুখেই থাকুক।

ভালোবাসার খেলা ■ অন্তরা সিংহরায়

প্রেমিক আর প্রতারকের পার্থক্য আর কতটুকু
সত্য আর মিথ্যার মাঝে ব্যবধান হয় যতটুকু।

দূরে যদি দূরত্ব বাড়ে, সম্পর্ক জটিল করে তোলে
ভরা বসন্তে মুছে সব, পাতা ঝরে অকালেই ভুলে।

ভালোবেসে নিজেকে কতটুকু করলে সমর্পণ
আমাদের চেয়ে আমিতেই মত্ত অহংকারী মন।

মুখে বলা ভালোবাসি, বাস্তবে এগিয়ে দিলে না ছায়া
কোথাও নেইকো আশ্রয় একরত্তিও নেইকো মায়া।

তবে সেটা হলো কি প্রেম! শুধুই হলো ব্যাভিচার
প্রতারিতের কান্না চাইবে ঠিকই নীরব বিচার।

চাওয়া পাওয়া হিসেব নিকেষই ব্যস্ত শুধু প্রাণ,
ভালোবাসার ঘরে লাভ ক্ষতির কি আছে বলো স্থান।

তবে কেন ভালোবাসার খেলায় মেতেছো হে জগৎ,
অন্যায়কে ভুল করে কোনোদিনই দিও না মদত।

ভালোবাসা ঈশ্বরের দান, সর্বদাই রেখো সম্মান
ক্ষুধার্ত মন অহর্নিশই তার করে চলে সন্ধান।

সার্থক করতে হলে ভুলতে হবে নিজের আকৃতি
ভালোবেসে গাছ হতে হবে, হতে পারো প্রকৃতি।

দু-এক কথা ৩০ ■ তীর্থঙ্কর সুমিত

সকাল দেখার অপেক্ষায়
প্রতিদিন বেরিয়ে পড়ি রাতের আঁধারে
বট গাছ থেকে কামরাঙা গাছ
কামরাঙা থেকে হিজল ছাড়িয়ে
রাত পেঁচারা জেগে ওঠে
আমার পায়ের শব্দে
ইচ্ছেরা বাঁধভাঙা খুশিতে...

নদীর কিনারে ভালোবাসার ঢেউ

তাইতো রাতের নিয়ন আলোয় আজ শহর সেজেছে।

ঘর ■ সন্ধ্যা রং

হৃদয়ে বেদনা জমে
স্বপনের হাতে
আমার বুকের খাঁচার মাঝে
গড়েছি যে ছোট্ট একটা ঘর
সে ঘরের মাঝে অচীন পাখি থাকে বসে
মাঝে মাঝে ডানার ঝাপট মারে
কখনও ভয় হয় কালবৈশীর ঝড়ে
উড়ে যাবে আমার ছোট্ট ঘর
গৃহহীন হয়ে নদীর পাড়ে বাঁধব বাসা
ক্ষণিকের তরে
নদীর ঢেউ এসে সে ঘরও যাবে ভেসে



ভাষা শহীদ স্মরণে ■ ডাঃ সমীর কুমার বেতাল

জীবনের মৃত্যুভয় ছিল না তাদের মনে
তারা চেয়েছিল বাংলা ভাষার মান।
চেয়েছিল বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা আর
মাতৃভাষা মর্যাদা রক্ষার সম্মান।
প্রতিদানে উনিশ আর একুশে ফেব্রুয়ারি
কেড়ে নিল কত তরতাজা প্রাণ
বাংলাদেশ ও আসামের মাটিতে
পুলিশের গুলিতে তারা দিল প্রাণ বলিদান।
অনেক সময় গেছে পেরিয়ে
তারা দেশের কাছে চির বরণীয়
মাতৃভাষা আন্দোলন দিয়েছে অনেক রক্ত
তারা দেশের কাছে আজও স্মরণীয়
বাংলা ভাষার জন্য পালন নয় কেবল দু-একদিন
বাংলার ঘরে ও বাহিরে আন্দোলন হোক প্রতিদিন।

অন্য বৃষ্টি ■ রনিতা দাস

এবার বৃষ্টি হলে ভিজব কিছুক্ষণ,
অনেকদিন হল বৃষ্টিতে ভিজিনা।
আনন্দ বুঝি না, উল্লাস খুঁজি না
অনেক হেঁটেছি, ক্লান্ত হয়েছে মন
এখন বড়ই একঘেয়ে জীবন।
তাই এবার বৃষ্টি হলে দাঁড়িয়ে ভিজব কিছুক্ষণ,
ধুয়ে যাবে গ্লানি, খুলে দেব কেশ
স্থায়ী হবে এই বৃষ্টির রেশ।
বৃষ্টি বাড়লে মেলে দেব ডানা,
একে একে কেটে যাবে সব ভয় আর দোটানা।
এরপর বৃষ্টি থামলে ফিরে যাব জানি
চারিদিকে থাকবে শুধুই সবুজের হাতছানি।

ভিজে যাব ■ সুদীপা সাহা

আকাশটা তুমি হও
আমি হবো মেঘ
বৃষ্টিতে দু'জনেই ভিজে যাব...
শূন্যে ওড়া ঘুড়ি হবো না কেউ।

যে জীবন অস্ত্রাঘাতে শুরু ■ অস্ট্রিক ঋষি

জন্মের পর কার সাথে পরিচয় হয়েছিল তোমার?
ধাত্রী? নাকি ধাত্রীর হাতে থাকা ছুরি –
কে তোমাকে অভিবাদন জানিয়েছিল প্রথম?

যদি ছুরি হয়, সে তো অস্ত্রই
যদি ধাত্রী হয়, হাতে তো অস্ত্রই ছিল

মানুষ –
চিরকাল তোমাকে অস্ত্রের সাথেই পরিচয় করাবে।

রবীন্দ্রভক্ত শিল্পী আকিনো ফুকু ■ প্রবীর বিকাশ সরকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় তো বটেই, তাঁর তিরোধানের পরও একাধিক বিশিষ্ট জাপানি নারী শান্তিনিকেতনে পা রেখেছেন প্রভাবিত হয়ে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম, শিক্ষা, চিন্তা, দর্শন, চিত্রকলা, শিশুভাবনা, সঙ্গীত, বিশ্বজনীনতা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁকে জানার জন্য, তাঁর মাধ্যমে বাঙালিকে, ভারতবর্ষকে জানার জন্য জাপানিদের কৌতুহল আজও শীর্ষস্থান দখল করে আছে। আধুনিক ভারত, স্বাধীন বাংলাদেশকে জাপানিরা চিনেছেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই। তাই বহির্বিশ্বে আজও বাঙালি প্রধান পরিচিতি সমগ্র এশিয়া মহাদেশে প্রথম নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাপানেও এর ব্যতিক্রম নেই।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় জাপানে ও ভারতে একাধিক জাপানি নারীর সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে মাদাম ড. কোওরা তোমি, নৃত্যশিল্পী ইরিয়ে শিজুয়ে, ইকেবানা-প্রশিক্ষক হাশিমাতো মাকি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন একা-একাই।

রবীন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন ১৯৪১ সালে, এর কয়েক মাস পরেই ডিসেম্বরে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যায়। ফলে রবীন্দ্র-জাপান দ্বিপাক্ষিক ভাববিনিময় সম্পর্কে সাময়িক ছেদ পড়ে। সেই সম্পর্ক পুনরায় উন্মুক্ত হয় ১৯৫৫-৫৬ সালের দিকে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন বিভাগের প্রধান ও ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. নাকামুরা হাজিমের যৌথ উদ্যোগে। আবার শিক্ষক ও বিভিন্ন স্তরের মানুষজন যাতায়াত শুরু করেন, ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙালি রবীন্দ্রভক্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরাও বিভিন্ন কাজ উপলক্ষে জাপানে আসতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জাপানে ১৯৬৭ সাল থেকেই প্রাথমিকভাবে উদ্যোগ গৃহীত হয়। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী সহ জাপান ভ্রমণরত অবস্থায় এই উদ্যোগ গ্রহণে নেতৃত্ব দেন মর্যাদা সম্পন্ন হেইবোনশা পাবলিশার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিমোনাকা ইয়াসাবুরোও। পরের বছর থেকেই বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে বহুবিধ পরিকল্পনা ও প্রকল্প নিয়ে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে ৬০ জনের বেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বসহ শতাধিক কর্মী ও সদস্য নিয়ে গঠিত হয় ''তাগো-রু কিনেনকাই'' তথা ''টেগোর মেমোরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন'', যার সভাপতি হন স্বনামধন্য কাগজ ব্যবসায়ী, চিন্তাবিদ এবং বিখ্যাত তোওয়োও বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. ওওকুরা কুনিহিকো।

এই অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সম্মানিত সদস্য ছিলেন ৫১ বছর বয়স্ক একজন খ্যাতিমান নারী চিত্রশিল্পী আকিনো ফুকু। ১৯০৮ সালের ২৫ জুলাই, শিজুওকা প্রদেশে সাধারণ এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। আকিনো যৌবনেই স্বপ্রচেষ্টায় চিত্রকলায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। চিত্রশিল্পী হিসেবে জাপানের প্রাতস্মরণীয় মনীষী, শিল্পকলার ইতিহাসবিদ, শিল্পাচার্য ওকাকুরা তেনশিন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ১৯০২ সাল থেকে যে গভীর প্রাচ্য ভাববিনিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কলিকাতায় সেই ইতিহাস তিনি জানতেন। এবং মনে মনে এই ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলাই বাহুল্য। তাই ১৯৬২ সালে যখন তাঁর কাছে প্রস্তাব আসে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ‘‘তাগো-রু কোকুসাই দাইগাকু’’ তথা ‘‘বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে’’ অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যাওয়ার জন্য, তিনি আগুপিছু না ভেবেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলেন। তখন তাঁর বয়স ৫৪ বছর। না জানেন ভাষা, না জানেন ভারত সম্পর্কে বিশদকিছু, না জানেন খাদ্য-খাবারের সংস্কৃতি কিন্তু সাহস করে একাই জাপান থেকে সাত হাজার মাইল দূরবর্তী বাংলা তথা শান্তিনিকেতন আশ্রমে পা রাখেন। এটাই তাঁর প্রথম বিদেশযাত্রা। আর এখানেই তিনি যা প্রত্যাশা করেছিলেন তাই পেয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। শান্তিনিকেতন তথা বাংলা ও ভারতের অন্যান্য বৌদ্ধ, হিন্দু তীর্থস্থান ভ্রমণ করে আপ্লুত হয়েছেন। বাঙালি এবং ভারতীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে ভালোবেসেই ফেলেছেন! যা তাঁর চিত্রকর্মের বিশাল বিশাল ক্যানভাসে উদ্ভাসিত হয়ে আছে! বাংলার নিসর্গ ও জনজীবন এত বিশাল ক্যানভাসে খুব কম জাপানি চিত্রশিল্পী এঁকেছেন বলে মনে হয়।

শান্তিনিকেতনে এক বছর অবস্থানকালে ভাষা ছাড়াই শুধুমাত্র চিত্র অঙ্কন করে ছাত্রছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তিনি, পারস্পরিক যোগাযোগ, সহবস্থানে কোনো প্রকার বাধাবিপত্তি ঘটেনি বলে জাপানি ভাষার সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলোতে তাঁর প্রদত্ত সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়। যেহেতু তিনি বাংলা বা ইংরেজি জানেন না একমাত্র মাতৃভাষা জাপানি ছাড়া, তাই ভিনদেশি সংস্কৃতিজাত ছাত্রছাত্রী, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে প্রথম থেকেই শাড়ি পরা ও স্থানীয় খাবারদাবারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর এই সংস্কৃতি তাঁর মনে নিখুঁত প্রভাব বিস্তার করে যা ‘‘লাল পোশাক’’, ‘‘সোনালি হরিণ’’, ‘‘হলুদ মাটি’’, ‘‘স্টেশন কলি’’, ‘‘সকালের প্রার্থনা’’, ‘‘ঘরেফেরা মহীষের দল’’, ‘‘আল্পনা’’, ‘‘চম্পাফুল’’, বিশাল ক্যানভাসে আঁকা ‘‘গঙ্গা’’ সহ আরও কিছু চিত্রকর্মে বিধৃত আছে। বিশাল মাপের ‘‘আকিনো ফুকু জাদুঘরে’’ শোভা পাচ্ছে প্রাচ্য তথা বাংলার নিসর্গ, মাটি, নদনদী, নারী, দেবদেবী, মন্দির, প্রাণী যা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের আরদ্ধ ছিল। বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। জীবনের শেষ ৪০ বছরকাল তিনি আরও একাধিকবার গিয়েছেন শান্তিনিকেতন তথা বাংলায়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে ছবি এঁকেছেন, সেইসব শিল্পকর্ম জাপানে প্রদর্শিত হয়ে চলেছে নিয়মিত।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন, ভারতে তিনি শান্তি ও সৌভাগ্যের দেখা পেয়েছিলেন। কারণ, ছবি আঁকার উৎকৃষ্ট সুযোগ হয়েছিল সেখানে তাঁর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে তিনি বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ যেমন নিজের ছবি সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার ছবিও যেমন নীরব, আমিও তাই, ব্যক্ত করাই তো ওদের কাজ, ব্যাখ্যা করা নয়।' – আমিও তাই মনে করি।" রবীন্দ্রভক্ত শিল্পী আকিনো ফুকু ২০০১ সালের ১১ অক্টোবর তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন ৯৩ বছর বয়সে।

লেখক পরিচিতি ঃ

রবীন্দ্র গবেষক প্রবীর বিকাশ সরকার

জন্ম ঃ ২০ ডিসেম্বর ১৯৫৯ বাংলাদেশের সিলেটের সুনামগঞ্জ

শিক্ষা ঃ কুমিল্লা হাই স্কুল (ভূতপূর্ব নাম বঙ্গ বিদ্যালয়), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। **বিষয় ঃ** ইতিহাস।

১৯৮৪ সালে জাপান প্রবাসী। জাপানি ভাষা ও সংস্কৃতির ছাত্র হিসেবে তিন বছর জাপানে লেখাপড়া করে সে দেশে স্থায়ী বসবাস এবং জাপানি নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন।

১৯৯২ সালে একমাত্র কন্যা সন্তানের জন্ম।

লেখালেখি ও সাহিত্য জীবন ঃ

১৩ বছর বয়সে জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠনের শাখার সাহিত্য সম্পাদক। ছড়া, ছোটগল্প, ফিচার ও ইতিহাস গবেষণা। জাপানে চাকুরির পাশাপাশি ১৯৯১ সালে 'মানচিত্র' নামে জাপানে প্রথম বাংলা পত্রিকা প্রকাশ যা জাপানি গণমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। জাপানের ইতিহাস, জাপান-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা শুরু।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ জানা অজানার জাপান; জাপানের নদী নারী ফুল; রবীন্দ্রনাথ এবং জাপান : শতবর্ষের সম্পর্ক; -এর ইংরাজি সংস্করণ - Rabindranath Tagore : India Japan Cooperation Perspectives ; জাপানে গণিকা সংস্কৃতি; সূর্যোদয়ের দেশে সত্যজিৎ রায়; জাপানি ব্যবসায়ীদের মননে রবীন্দ্রনাথ।

জাপানি ভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ ঃ নিহোম পা আজিয়া অ মেজানে সাসেতা (জাপান এশিয়াকে জাগ্রত করেছে), বঙ্গবন্ধু এবং জাপান সম্পর্ক।

উপন্যাস ঃ তালা, প্রচ্ছায়া, অতলান্ত পিতৃস্মৃতি, অপরাহ্নে বৃষ্টি, প্রথম সূর্য (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)

রবীন্দ্রনাথ ও জাপান সম্পর্কে অজানা তথ্যগুলি সংগ্রহ করার গবেষণায় নিরন্তর কাজ করে চলেছেন।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড ঃ বাংলাদেশ সোসাইটি-জাপান, বঙ্গবন্ধু পরিষদ জাপান শাখা, আড্ডা টোকিও।

২০১২ সাল থেকে জাপানের Asian Solidarity Council for Freedom and Democracy-এর অন্যতম পরিচালক।

বিপন্ন সময় ■ ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী

আজ আমাদের জীবনের বড়ো বিপন্ন সময়। এই বিপন্ন সময়ে আমরা কার কাছে যাবো? প্রার্থনার জন্য ঈশ্বর আছেন বা নেই। তবুও আমরা শান্তি চাইলে পাই না। খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানের জন্য কর্ম প্রয়োজন, মুদ্রাও প্রয়োজন। তবুও দেশে বেকারত্ব হাহাকার। নানা ধর্মে ঈশ্বর আছেন। সকলেই বলেন জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি। তবুও তো অনাহারে কত মানুষ আত্মহত্যা করে। ধর্ম বলে আত্মহত্যা মহাপাপ। ভিক্ষা করে জীবন ধারণ হয়তো বৌদ্ধ যুগে হতো। চৈতন্য যুগে দেখা গেছে মানুষ ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে কত দূর যেতে পারে। বর্ণভেদ জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার চরম সময়ে তিনি ভক্তিপ্লাবন এনেছিলেন। সমাজের মানুষের মধ্যে একতা আনতে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের মানুষদের ও একত্রে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে উদ্ধার করেছিলেন। অর্থাৎ মানবপ্রেমের জয়গান গেয়ে মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবেই তিনি কৃষ্ণ মন্ত্রে নবজাগরণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মীরাবাঈ কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে আজীবন সঙ্গীত কাব্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, এজন্য সংসার তাঁকে ক্ষমা করেনি, বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টাও করেছে। জানি না কোন মন্ত্রবলে সেই বিষপাত্র অমৃতে পরিণত হয়েছিল। বাস্তবতা বলে সমাজসংসারের হিংসা ঈর্ষা লোভ অত্যাচার মানুষকে এক সহনশীলতায় উত্তরণ ঘটায়। যেখানে সে কষ্ট দুঃখকে অতিক্রম করতে পারে। মুক্তির সন্ধান পায়। যেমন গৌতম বুদ্ধ মুক্তির আলো দেখেছিলেন। শোক, মৃত্যু, জরা, বার্ধক্যকে অতিক্রম করার পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। জৈন ধর্মেও আত্মনিপীড়নের কথা আছে।

এরই জয়গান পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করে গেছেন তাদের আধ্যাত্মিক জাগরণের মধ্যে, সাহিত্যের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে। যেখানে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ আর কর্মযোগের সম্মিলন ঘটে। একই চেতনার উপলব্ধিতে আমরা অনুপ্রাণিত হই। শিক্ষা যখন চেতনার বিকাশ ঘটায় যখন মানুষের মধ্যেও সেই জ্ঞানের বিপ্লব জাগাতে ইচ্ছে করে তখনই মনের মুক্তির উত্তরণ ঘটে। এই মানবমুক্তির চেতনা যা ধারণ করে তাই ধর্ম হয়ে ওঠে। যদি তার নাম নিরাকার বা নাস্তিকতা হয় তবুও তা কুসংস্কারে বিশ্বাসী নিজ বা অপর ধর্মের মানুষের হত্যা বা নির্যাতনকারী তথাকথিত আস্তিকতার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি ভালো। সেই ধর্মই কাম্য যখন মানুষ ভেদবুদ্ধি পঙ্কে নিমজ্জিত হবে না। ধর্ম তন্ত্র কখনই কোনো মানুষকে রক্ষা করতে পারেনি। এমন কি নিজ ধর্মের মানুষকেও না।

খ্রীষ্ট ধর্মের ক্যাথলিক-প্রোটেস্টানদের যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে পরিনত হয়েছে। ইসলামের কারবালার ইতিহাস বহন করে পরবর্তীকালে সিয়া-সুন্নির বিবাদ। আহমদিয়ার নিগ্রহ সবই ধর্মের জন্য সাম্রাজ্যবাদের এক নির্মম চেহারা। যা কখনও জাতপাতের নামে

মানুষের ওপর বিভৎস অত্যাচার, কখনও অস্পৃশ্যতার নামে অমানবিক আঘাত। ধর্মের জন্য আত্মহত্যা, সংসার জলাঞ্জলি অথবা নিজ সন্তানকে হত্যাও সংঘটিত হয়েছে। পৃথিবীর সব ধর্মই সবার সঙ্গে বিভেদের রক্তচক্ষু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শত্রুতা আর অসহিষ্ণুতার দুর্বিপাকে প্রতি যুগেই মানবতার অবসানে মানুষেরই সভ্যতার সঙ্কট সংঘটিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু যেমন শত শত সংসার উজাড় করে বিধবা ও অনাথ শিশুদের সংখ্যা বাড়িয়েছে তেমনই অর্থ সংকটে, সতীত্বের সংকটে, আত্মহত্যার সংখ্যা বাড়িয়েছে। অনাহারে মৃত্যু আর মহামারীতে মৃত্যু তো ঘটে চলেছে যুগে যুগে। বিজ্ঞানের উন্নতির কত রোগের চিকিৎসা হয়েছে, হয়তো মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, কিন্তু পরিসংখ্যান দেখলে মানব সভ্যতার মৃত্যুর একইভাবে ঘটেছে। কখনও অর্থের সংকটে কখনও হিংসা সন্দেহের পরিনামে মৃত্যু ঘটেই চলেছে। কোন সংস্কার যখন মানুষ তৈরি করে তখন তার কিছু উপকার বা অপকার থাকতে পারে। মনে রাখা উচিত এই সব সংস্কার মানুষের মনেই প্রথম উদ্ভুত হয়। এখন এই সংস্কারটি যখন মানুষের উপকারের বদলে অপকার করে অথবা অযৌক্তির প্রমাণিত হয় তখনই সেটাকে কুসংস্কার বলবো। এমন অনেক কুসংস্কার আছে যেটা আগেকার দিনের মানুষের মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু এখন অচল। যেমন ভূতে ভয়ে রাম নাম জপ, অপবিত্র জিনিসে গঙ্গার জল ছিটিয়ে পবিত্র করা, কোন অপরিচিত লোক ছুঁয়ে দিলে স্নান করা, মাংস খেয়ে জামাকাপড় কেচে স্নান করে ঘরে প্রবেশ করা, পরীক্ষার আগে ডিম বা কলা না খাওয়া, পাঁজি দেখে শুভ সময় দেখে কাজে বের হওয়া – এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। ‘‘মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা যথা ইচ্ছা তথা যা’’ এমন সব খনার বচন এখন অচল। শাস্ত্র বিরুদ্ধ কত নির্দেশ যেমন, এলোচুলে না থাকা, সন্ধ্যার পর আয়না না দেখা, খড়ম পায়ে মেয়ে মানে অলক্ষ্মী, মেয়েদের একা না বেড়াতে দেওয়া, সঙ্গে পাহারাদার পাঁচ বছরের বালকও পুরুষ হিসেবে গ্রাহ্য। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতাটি স্মরণযোগ্য)। কিশোরীর বিয়ে সম্পর্কে জ্ঞান হবার আগেই বিয়ে (বাল্যবিবাহ) এবং বৈধব্য যন্ত্রণাভোগ, সাদা থান পরানো, নিরাভরণা করে খেতে না দেওয়া, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা – এমন অনেক অত্যাচার নির্যাতনই বহু বছর ধরে হয়ে এসেছে।

সতীদাহ বহুবছর বন্ধ হয়েছে রামমোহন রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায়। বাল্যবিবাহ বন্ধ, বিধবা বিবাহ চালু হয়েছে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায়। কিন্তু বধূহত্যা, কণ্যাভ্রূণ হত্যা, আত্মহত্যার ঘটনা এখনও চলছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়েছে তবুও নারীরা সংসারের আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। নির্যাতনের হাহাকারে জীবন অতিবাহিত করছে। স্ত্রীশিক্ষার পরবর্তী সুখের সংসারও সহজলভ্য হচ্ছে না। কারণ বিবাহ পরবর্তী জীবন সেই সংসারের মানুষগুলোর মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। উদারমনস্ক মানুষের সংস্রবে মূর্খরাও

শিক্ষিত হয়ে ওঠে কিন্তু লোভী স্বার্থপর মানুষের সংস্রবে শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষও অসহায় নির্যাতনের অন্ধকারে নিক্ষেপ হয়। বিশেষত সে যদি নারী হয়। নজরুল ইসলাম নারী কবিতায় লিখেছেন –

“জগতে যত বড় বড় জয়
বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নি বধূদের ত্যাগে
হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর
লেখা আছে ইতিহাসে
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি
কত বোন দিল সেবা
বীরের স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে
লিখিয়া রেখেছে কেবা।”

শিক্ষা সব শিক্ষিতদের তো সঠিক চেতনা দেয় না। ডিম কলার পুষ্টি আমরা জানি তবুও অনেক শিক্ষিত মানুষ এখনও পরীক্ষার আগে সন্তান বা নাতি-নাতনিদের ডিম কলা খেতে দেন না। পৈতে বাড়িতেও এখন মাংস খাওয়া হয়। আসলে বর্তমানে সবকিছুই নিজেদের সুবিধামতো মেনে চলা হয়। আগে বারবার হাত ধোয়াকে ম্যানিয়া বলা হতো কিন্তু বর্তমানে করোনার যুগে বারবার হাত ধোয়ার যৌতিকতা আছে। সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় আমরা জানি, তাই রাহুগ্রাসের আতঙ্কে ঘরে বসে থাকি না। বিজ্ঞানের চেতনায় যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে মাস্ক পরার যৌক্তিকতা আছে কিন্তু বোরখা পরার যৌক্তিকতা নেই। যদিও একসময় ঘোমটা বা বোরখা পরা আভিজাত্য ভাবা হলেও একবিংশ শতকে শিক্ষিত মানুষের এমন পোশাক কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। বিকৃত পুরুষরা আগেও ছিল এখনও আছে, তাদের মানসিকতা কখনও পাল্টায় না। নারীদের মতো পুরুষদেরও সভ্য সমাজের উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে, নইলে সমাজসংস্কার বৃথা। একালে ভূতের ভয় গিয়ে স্বৈরাচারীর আতঙ্ক বেড়েছে। তাই হয়ত এখনও তালিবান শাসন ফিরে আসে আফগানিস্তানে। সবচেয়ে বিস্ময়কর, তারা শিক্ষিত তালিবান। এই বিপন্ন সময়ে মুক্তির আলো কোথায়? কোন ঈশ্বর দেখাবে সেই আলোর পথ, মুক্তির পথ, সভ্যতার পথ?

তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এগুলোর উপর অনেকটাই নির্ভর করে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য বা ইমোশনাল হেলথ। বর্তমানে কিছু স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রচার ইমোশনাল হেলথ র‍্যাঙ্কিং ইনডেক্সকে নিরন্তর নিম্নমুখী করে চলেছে। অবিশ্বাস, নিরাপত্তার অভাব, ভয় এইগুলি যদি সামাজিক শিক্ষা ও সচেতনতার অংশ হয় তাহলে ডিপ্রেশন, হতাশা, স্ট্রেস এগুলো জীবনের সঙ্গী হবেই। আর সেই কারণেই এগুলিকে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বলে মেনেও নিয়েছেন অনেকেই। এছাড়া রাগ, ক্রোধ, ঈর্ষার মতো কিছু ব্যক্তিগত স্থিতি মানসিক শক্তিকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে, ফল স্বরূপ ঘুন ধরছে সামাজিক স্বাস্থ্যেও। কিন্তু তবুও এর থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা ভাবতে হবে জনমানসকেই।

ভয় ইমিউনিটিকে গ্রাস করে, আবার ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করে লো ইমিউনিটির ব্যক্তিকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিক দুর্বলতাই এই শারীরিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যিনি নিজের ওপর বিশ্বাস রেখে প্রকৃতির নিয়মের লঙ্ঘন করেন না, অকারণে ভয় নেই, তাদেরকে ইমিউনিটি নিয়েও ভাবতে নেই। একমাত্র নিজের আন্তরিক শক্তির সাথে পরিচয় হলেই নিজের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং মানসিক স্বাস্থ্য গঠন হয়। তাই নিজের মানসিক স্বাস্থ্য গঠন ও বিকাশের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। আমরা যতদিন রোগী হয়ে বাঁচাটাকে নরমাল ধরে নেব ততদিন সেই গণ্ডির বাইরে বেরোতে পারবো না এবং সুস্থতার প্রকৃত স্বাদ পাব না। প্রকৃতপক্ষে আমরা যে ধরনের সমাজ ও দেশ গঠন করতে চাই সে ধরনের চিন্তা ভাবনাই আমাদের করা উচিত। কারণ সংকল্প থেকেই সৃষ্টির নির্মাণ হয়। আমরা যদি সর্বদা রোগ নিয়ে চিন্তা করি, রোগের খবর শুনি, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা সবাই রোগীতে পরিণত হব। আমার ছড়ার গ্রন্থ ‘‘ছন্দে গাঁথা স্বাস্থ্য কথা’’ থেকে একটা ছড়া এখানে তুলে দিচ্ছি –

‘‘রোগের সচেতনতার চেয়ে ভালো / স্বাস্থ্য সচেতনতা, / তারও অধিক ফল দেবে, সাহস - / শরীরচর্চা যেথা’’।

অর্থাৎ রোগের সাথে লড়াই করার জন্য আপনার শারীরিক ও মানসিক শক্তিটাই কাজে লাগবে, রোগ বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান নয়। শুধুমাত্র রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বা অতিসচেতনতা আমাদের অজান্তেই অবচেতন মস্তিষ্কে ভীতির সঞ্চার করে মানসিক শক্তিকে দুর্বল করতে পারে। আর যদি আপনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হন তাহলে রোগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তার সাথে আর একটা কথা হল যে আপনি শুধু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হলেই নিরোগী থাকতে পারবেন না, তা পালন করতে হবে। সে কারণেই নিরোগী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী একমাত্র তাঁরই থাকা সম্ভব যিনি নিজের অন্তরিক শক্তি সম্বন্ধে অবগত থেকে নিয়মিত শরীর চর্চা করেন সাথে স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ■ রাজা দেবরায়

বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বাংলা কাব্যে তিনি নবযুগ এনেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা হিসেবে মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় আসনের অধিকারী হয়ে আছেন।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি জন্মেছিলেন। বাবা রাজনারায়ণ দত্ত এবং মা জাহ্নবী দেবী। ছোটবেলা থেকেই মায়ের কাছে কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের কাব্য ও গল্পকাহিনী শোনার পর বাল্যকাল থেকেই তিনি ইংরেজী ভাষা বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ব করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কৈশোরে এবং যৌবনেও তিনি ইংরেজদের মতোই কবিতা লিখতে পারতেন।

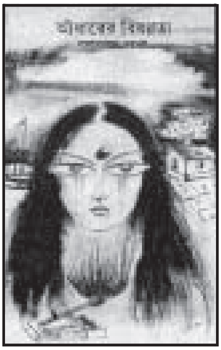
বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের অবির্ভাব কবিরূপে নয়, নাট্যকার রূপে। তিনি মাদ্রাজে থাকার সময় 'রিজা' নামে একটি ইংরেজী নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু সেটা ছাপা হয়নি। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষত বাংলা নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, মধুসূদন দত্তের পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে গভীর পড়াশোনা ছিলো। দেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি কাব্যে-নাটকে যুগধর্মের আদর্শে নবরূপে বর্ণে, গন্ধে নবজীবন দান করেন। মধুসূদন দত্ত বিদেশী কবিদের ভাব, ভাষা, ছন্দ অনুসরণ করলেও তা ভারতীয় জীবন-সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে অপূর্ব শিল্পসৌকর্যে নতুনতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। মধুসূদন দত্ত আধুনিক জীবনের বার্তাবহ বাঙালি জীবনের মহাকবি। দেশের ভাষা, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি মহিমাদীপ্ত করে তোলেন।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত নয়টি সর্গে বিন্যস্ত কবির যুগান্তকারী মহাকাব্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য'। গ্রন্থটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির অনুরাগী বন্ধুরা কবিকে হোমার, ভার্জিল, কালিদাস ও মিলটনের সঙ্গে তুলনা দিতে থাকেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ বহু গুণীজন সমাদৃত বিশাল সভায় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে কবিকে মানপত্র এবং রুপোর পানপাত্র দিয়ে সম্বর্ধনা জানান। কোনো বাঙালি কবিকে প্রকাশ্য সভায় সম্বর্ধনা এই প্রথম। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ রোমান কবি ওভিডের পত্রকাব্য অনুসরণে 'বীরাঙ্গনা' কাব্য রচনা করেন। তিনি একুশটি পত্রকাব্য লিখতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এগারোটি লেখার পর কাব্যটি বের হয়। তাঁর কাব্যে নায়িকারা নায়ককে পত্র লিখেছে। এই কাব্যের নায়িকারা হলেন শকুন্তলা, রুক্মিণী, কৈকেয়ী, দ্রৌপদী প্রমুখ। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রজঙ্গনা কাব্য' রচনা করে প্রমাণ করলেন যে

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের কাব্য রচনাতেও তিনি কতখানি নিপুণ। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে আবেগ, ব্যাকুল, গীতিরসের মূর্চ্ছনা ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলির নায়িকা কৃষ্ণকান্ত শিরোমণি শ্রীরাধিকার মর্মব্যাথা বর্ণিত হয়েছে।

মধুসূদন দত্তের রাধা একেবারে লৌকিক জগতের রাধা, কৃষ্ণের সঙ্গে দৈহিক মিলনে এই রাধা সুতীব্র ব্যাকুল। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়। বিদেশে থাকার সময় দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, মঠমন্দির, উৎসব পালাপার্বণ, বাংলার নদনদী, বাংলার কবি ও মনীষীদের প্রসঙ্গে কবির বিচিত্র অনুভূতি রূপে রসে ভরে উঠেছে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'।

কবির শেষ জীবন বড়ই দুঃখের। চরম আর্থিক সঙ্কটে পড়ে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কঠিন রোগে পীড়িত হন কবি। অর্থের অভাবে কবির চিকিৎসা আর চলছিলো না। তাই কবিকে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। একদিকে নিদারণ অর্থ সঙ্কট, অন্য দিকে রোগের প্রাবল্য তাঁকে জর্জরিত করতে থাকে। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন কবি মধুসূদন দত্ত কলকাতায় শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন।



আঁধারের বিষন্নতা

মূল্য ২০০্ টাকা

গল্প মঞ্জরী

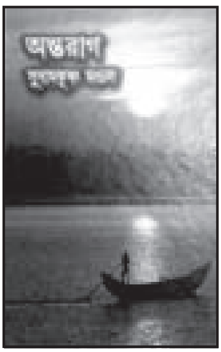
মূল্য ২০০্ টাকা

প্রকাশক ঃ

ইসক্রা

৬৭, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০৯









অস্তরাগ	ভাসান	এখন বিদ্রোহের কাল
(উপন্যাস)	(গল্প সংকলন)	(কবিতা সংকলন)
মূল্য ৩০০্ টাকা	মূল্য ৩০০্ টাকা	মূল্য ১৫০্ টাকা

প্রকাশক

লিপিকা

৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান ঃ

লিপিকা

৩০/১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

গ ল্প মা লা

খুনী ■ সুদামকৃষ্ণ মণ্ডল

গোলাম খেতে বসেছে। সামনে রাবেয়া – সেও খসমের সাথে প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি কুড়োতে যায়। হাঁটু সমান কাপড়ের অন্দরে প্রত্যহ সমানে খিদে লুকিয়ে থাকে। তারও খিদে চাগাড় দিচ্ছে। সাত সকালে আটার রুটি দু'খানা তাও আবার বাসী। রুটি কম কিন্তু জল তো কম নেই তাই পেট ভরে পান করেছে। মরদকে দিয়েছে চারখানা। না খেলে পিঠে সইবে কেন। তারপর আবার তানিয়া ও মুজিবর আছে। স্কুলে পাঠাতে পারেনি। যেত। দেড়খানা করে দিয়েছে। ফিরতে অনেক দেরী হবে বলে পাঠায়নি। কাছে কুচো পয়সা থাকলে হয়তো যেত। যা রোজগার গতকাল রাতে তেল মশলা চাল আটা কিনে পকেট গড়ের মাঠ।

ওরা ভাইবোন পাশে বসেছে ভাত খেতে। দু'বাটি চাল পাঁচ'শ গ্রাম হবে। বিলের আলে কলমী শাক আর পুকুরের শুশনি শাক ভাইবোন কোঁচড়ে এনেছে। শাক তরকারি। আলু ভর্তা দিয়ে মুজিবর খাচ্ছে। কাঁচা লঙ্কাও জোটেনি। বীরু মাস্টারের বাড়িতে গোবর বইতে গিয়ে কবেকার সাদা ফটকা লংকা শ'দুয়েক আন্দাজ আনিয়ে ভাজা। প্লাস্টিকের কৌটয় মজুত আছে। গোলাম আবার ভাত চাইল – আর ভাত হবে?

— ওদের তো এই বেইড়েছি। তাও কুলোবে না। হাঁড়ির কোণায় যা পড়ে আছে, এই দেখো আমি বাইড়তেছি।

অভিমানে ক্ষোভে ভাত বেড়ে শাকের কড়াইতে রাখছে। লালচে মোটা চালের ভাত। রাবেয়া না খেয়ে খেয়ে শুঁটকি মাছের মতো শুকিয়ে গেছে।

— চাল দুমুঠো বেশি নিতে পারত। এত বড়ো মেয়ে ছাবাল বোঝে না, আন্দাজ করে কি তুইও বলতে পারিস নি?

— তুমি তো কালকে বললে, চাল যা এইনেছি দশ দিন যেন হয়। — এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

বারবার সে যখন সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তার বিবেক বিরোধী দলে ভোট দেবার জন্য মনস্থির করে। কিছু পাবার আশায় যেই না মিছিলে হেঁটেছে জমিদারি বেনামী সতের কাঠা চাষ জমিতে ঝাণ্ডা পুঁতে মেম্বার লোকবলে দখল করেছে। হাড়কিপটে সন্ধানী মেম্বার বলেছিল — বেনামী সম্পত্তি, এতো সরকারের প্রাপ্য। সরকারের রেশন খাবি – টিউ কলের জল খাবি – রাস্তায় হাঁটবি – একা আর কত সুযোগ নিবি? যা তুই যে বাপেদের কাছে মাথা গুঁজেছিস। এখন দেখি তোর কোন বাপ রক্ষা করে? যা গে যা। বেশি বেড়ে গেছিস নারে? গরীবের গাঁড়ে এত তেল কেন? আরো কী সব কাঁচা খিস্তি খেউড়। শুনলে

পিলে ঘর চমকে যাবে। অশ্লীল খিস্তি খেউড় হুমকি শুনে রাবেয়াও বাধা দিতে সাহসে কুলায়নি।

— আব্বুর খেতি বইলে দেখি ভুইলে যায়। মুজিবর বলল।

— আম্মুর খিদে পায় তুমি জানো না? তাহলে বলো কেন চাল কম নিতে? তানিয়া বলল।

— হায় আল্লাহ জ্বালায় বলি। দে পানির মগ দে।

পেট যে শোনে না – বহুত্ নির্দয় ক্ষেপাটে জেদী।

জলের মগ ধরে ঢকঢক করে জল ভরে নিল পেটে।

একটা ঢেকুর তুলল। লম্বা ঢেকুর শুনে মুজিবর বলল – পেটে এত্ত খালি বাতাস ছিল!

রোগা পটকা রাবেয়া, শীর্ণ শরীরের হাল আগে তো ছিল না। নিটোল স্বাস্থ্যবতী ছিল। ভারি বুকের বহর দেখে গোলাম বেজায় খুশি ছিল। যেন পাকা হিমসাগর আম। এখনও আছে অবশেষ টুকু নিয়ে। ও বলত, ছাওয়ালের দুধ কিনি খেতে দুবোনি। পয়মাল শরীর আজ যেন ঝলসে গেছে। জীর্ণতা রোগ নয় অভুক্তের কারণ। ময়লা আবর্জনার স্তূপ ঘেঁটে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে।

গোলাম জেদে পড়ে ভোট দেয় না পাড়ার মেম্বারকে। কার্ড ছিল "ক" কার্ড। এতো করে বলেও "গ" করে দিয়েছে। জব কার্ড পায় নি। ত্রিপল চেয়েও পায়নি। ওল-ধান-ত্রাণের কুপন যখন যা চেয়েছে পায়নি। সে নিজেই কারণ হাতড়ে বুঝেছে এই পাড়ায় সে-ই একমাত্র মুসলিম। বঞ্চিত করলে পাড়া ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে।

তারও কি এমন হতো? সুন্দরবনের সমস্ত নদী বাঁধ নিরাপত্তার দাবিতে মিছিলে পা মিলিয়েছিল। বরাদ্দ টাকা ফেরত কেন যাবে – জবাব চাই জবাব দাও। রাতে ফেরার পথে মাতাল ড্রাইভারের ভুল গাড়ি চালানোর জন্য ভ্যান থেকে পড়ে দু'চোখের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে যায়। চোখ তাই অকেজো। ছেলে সুস্থ করে সংসারে আঁধার সরিয়ে আলো ফেরানোর জন্য ভিন রাজ্যে পাড়ি।

না হলে যা হোক কিছু বারো মাস চাষ করে কিছুটা অভাব লাঘব হতো। তা আর হলো না। গরীবের ঘরে কীই বা দিন কীই বা রাত। জ্যোৎস্না রাতে আলো এমনি পড়ে। সবাই সমান। রাজনীতির সুবিধাখেকো গোঁয়াড়ে মানুষগুলো নীচুতলায় বসে এভাবে তো ছড়ি ঘোরায়। জনদরদী দলের মানব দরদী সরকার।

ঘরটুকু আছে। তাপ্পি দেওয়া টালি-খড়-তেরপাল সবরকম দিয়ে রোদ-বৃষ্টি-শীতে কোনও রকম দিন কাটে। জল জঙ্গলের ভয়ে কখন কি হয় কে জানে। দু'দিন খরা তো চার দিন ঝড় অতিবৃষ্টি। বৃষ্টি না হলে মাগ-ভাতারে দু'পয়সা কামানো যায়। ভাঙা ঘরে নিদ্রাভঙ্গ হলে ভাবে একটা ভ্যান হলে ভালো হতো অথবা ট্রলি। মেঘনাথের ভ্যানটা পড়েই আছে। ওর

ছেলে ভিন রাজ্যে কামাতে গেছে। উঠোনে ভ্যানটা পড়ে আছে। অন্ধ মেঘনাথ অকালে বৌ হারিয়ে ছেলে বৌমার করুণার প্রার্থী।

— মেঘনাথদা কেমন আছ বলো?

বারান্দার খাটে অন্ধ চৌকিদার হয়ে বসে থাকে। দু'বেলা দু'মুঠো খাইয়ে দিলে আর কি? স্নান টয়লেট হাত ধরে নতুন বৌটা করে। কিন্তু নতুন বৌ ঘরে রেখে ওর যাওয়া ঠিক হয়নি। প্রতিবন্ধীর সরকারি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে মেম্বার তো বার্তা নিতে আসত। সেতো অনেক দিন আগের কথা। কিন্তু এখন কি কারণে প্রতিবন্ধীর বৌমার সাথে পুকুর ঘাটে কলা গাছের আড়ালে ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর করে। জনহিতৈষী কাজ ঘরের অন্দরমহলের বৌটার সাথেও চলে। যাক বাবা দেখেও না দেখার ভান করে গোলাম গলা খাঁকারি দিয়ে বেড়ার ঝাঁপ খুলে উঠানে আসল।

— ঠিক আছে আমি এই চটটায় বসছি।

ইতঃবসরে বেড়া টপকে মেম্বার চলে গেল। হাঁটু সমান বেড়া টপকানো যায়। গোলাম বুঝতে পারল ঝাঁপের শব্দ হতে পারে – আর মেঘনাথের অহেতুক সন্দেহ বৌমাকে বিব্রত করতে পারে – তাই সে বেড়ার বিশেষ একটা জায়গাতে যেতে আসতে পথ তৈরি করে ফেলেছে।

— বলছি ভ্যানটা পড়ে আছে। লোহায় জঙ্ ধরে নষ্ট হচ্ছে – তোমার শখের মানে ভাতের রোজগার হতো।

— খোকাতো তেল মোবিল দিয়ে ইটের উপর তুলে পলিথিন ঢাকা দিয়েছে। না না ভালো আছে।

— প্রত্যেক দিনের ভাড়া দিয়ে দোব। যদি ভাড়ায় দাও – সেজন্যই বলছিলুম। আমারটা তো খুইয়েছি।

— কে? গোলাম না? আমি অন্ধ মানুষ –

— হ্যাঁগো দাদা।

— ওখানে পিঁড়ি আছে ভাই? বৌমা – একটা বসার জায়গা দাও না। গোলামের সাথে অ-নেক দিন পরে দেখা হল – একটু গল্প গুজব করি।

— ঠিক আছে আজ যা। বৌমাকে দিয়ে রাত্রে ছেলের কাছে ফোন করি। তবে হবে ধরে নে। লোহা লক্কড় জিনিস। চালালে তো ভালো থাকবে। তবে তুই সকাল সকাল আসিস তাহলে।

— ঠিক আছে আসি দাদা।

তাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর মরা চাঁদ বাঁশ বাগানের মাথায় জীর্ণ আলোর চাদর বিছিয়েছে। পুব আকাশে শুকতারা তার সাথী হাওয়ায় দুলছে বাদুড়ের লুকোচুরি। তাল তেঁতুল গাছে কাক পক্ষীর কলরবে নিদ্রাভঙ্গ সবার। গোলমের বুকে আশার সঞ্চার আরও দৃঢ় ভাবে প্রাণিত করছে। তাই সে বিবিকে সাত সকালে প্রাত্যহিক কাজ শেষ করতে বলে মেঘনাথের বাড়িতে এসে চক্ষু চড়ক গাছ। এতো দূর হাত বাড়িয়েছে!

বৌমার ঘরের দরজা হাঁ করে খোলা। সর্বাঙ্গের কাপড় অবিন্যস্ত। মেম্বার খালি গায়ে গেঞ্জি চড়াচ্ছে। পাশে দড়ি থেকে পাজামা গামছা ঝুলছে। হালকা আলোয় দেখা যাচ্ছে মেম্বারের শরীরী অবয়ব। চিনতে তার ভুল হয়নি। নির্ঘাত মেম্বারের কীর্তি। হবে নাই বা কেন? নতুন বৌয়ের আগুন শরীর জ্বললে জলের সান্নিধ্যে তো আসতেই হবে। তবুও সে না দেখার ভান করে বারান্দায় খাটের কাছাকাছি গিয়ে বলল, মেঘনাথদা আমি আসছিলুম।

মুহূর্তে মেম্বার স্বরূপ ধারণ করে বলল, এত্ত সকাল সকাল তুই এখানে?

বৌমাকে নিশ্চই তুই মেরেছিস! ও মেঘনাথ বাবু – ও মেঘনাথ বাবু – তোমার বৌমাকে রেপ করে মেরে ফেলে গোলাম কি হাতে পায়ে ধরে মিটিয়ে নিতে চাইছে?

— অ্যাঁ! কি বললে? কে কে তোমরা?

— আমি মেম্বার। রাতে এত বড়ো ঘটনা ঘটল জানলে না! হাতে নাতে গোলামকে নিয়ে বসে আছি। থানায় ফোন করেছি – পুলিশ আসছে। গোলামের দিকে তাকিয়ে চোখ কটমটিয়ে বলল।

— পুলিশ পুলিশ কেন?

— গোলাম। তোমার বৌমাকে রেপ করে মেরে ফেলেছে। সারা রাতে এত ঘটনা ঘটে গেল! তুমিই কি শেষ ঘুমে —

— মে-ম্বা-র! তুমি মুখ সামলে কথা বলো —

ভয়ংকর পশুর মতো জেগে উঠল গোলাম।

— শালা হারামী। বৌটাকে তো ছিঁড়ে খেতে খেতে হাড় পাঁজরা বের করে, পরের বৌর দিকে নজর ফেলে মেরেই দিলি? ঘরে তোর মেয়ে বৌ নেইরে শালা পাষণ্ড?

— মে-ম্বার-র! গর্জে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

মেঘনাথের বুঝতে অসুবিধা হলো না। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে জমায়েত সরিয়ে গোলামকে নিয়ে গেল।

দরজায় দুমদাম ধাক্কা আর সেই সঙ্গে চার খানা হেঁড়ে গলার চিৎকার, "ও জ্যেঠু, ও জেঠিমা দরজা খোলো গো, তোমাদের দুপুরের খাবার এনেছি, তোমাদের খিদে পেয়েছে তো"। এই দশদিনে বেশ গা সওয়া হয়ে গেছে ওনাদের মানে যবে থেকে কোভিড পজিটিভ হয়েছেন, মানে পরেশ ও করবী সান্যাল, জগদীশপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী। জগদীশপুরে পরেশবাবুকে সবাই খুব মানেন। কড়া আর ভালো শিক্ষক হিসেবে। উনি গড়েও ছিলেন নিজের ছেলেকে নিজের আদর্শে। "ওরে দাঁড়া আসছি আসছি, দরজা ভেঙে ফেললো দেখি" বলতে বলতে দরজা খুলে বেরোলেন করবীদেবী। যা ভেবেছিলেন তাই। সামনেই চার মূর্তিমান দুপুরের টিফিন বাক্সটা নিয়ে দাঁড়িয়ে, মানে বাবলু, রাজু, গনশা আর হিরু। করবীদেবী বেরোতেই দরজার সামনে বাক্সটা রেখে বাবলু বলল, "ও জেঠী, তোমাদের দুপুরের খাবার এনেছি গো, তবে নিরামিষ গো আজ, পয়সা ফুইরে গেছে, রাতে ডিমভাত আনবো। এখন চলি গো, সাবধানে থেকো" বলে চারজন পিছনে ফিরতেই ঘরের ভিতর থেকে একটা ভারী আওয়াজ ছুটে এলো, "এক পাও নড়বি না একজনও। দাঁড়া এখানে চুপ করে।" ঠিক তারপরই দরজায় দেখা গেলো গলার মালিক পরেশ সান্যাল বাবুকে। দরজার কাছে একটা খাম রেখে ওদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই নে, এতে কিছু টাকা আছে। আমাদের কাজে লাগবে না, তোদের কাজে লাগবে। নিয়ে যা।" চারমূর্তি তো ভ্যাবাচ্যাকা। "এই রে কি হলো ব্যাপারটা।" হিরু আমতা আমতা করে বলল, "না না স্যার ও আমরা ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলবো"। কিন্তু হিরুর কথা শেষ হওয়ার আগেই পরেশবাবু গর্জে উঠলেন, "তোরা নিবি না দেবো সবকটার রানের গোড়ায়।" রাজু ভয়ে ভয়ে গিয়ে খামটা তুলে নিল। ওরা ছাড়া আর কে জানবে যে এই হেডস্যার-এর মারের ভয়ে স্কুলছাড়া হয়েছে ওরা চারজন। আবার যদি কেলায়, এখন পাড়ায় একটা মান সম্মান আছে না। রাজু ভয়ে ভয়ে বলল, "না না স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে, এই তো নিচ্ছি।" এর মধ্যেই গনশার ফোন বেজে উঠলো। গনশাকে বলতে শোনা গেল, "সবই তো বুঝলাম, কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডার তো সাইকেলে আনা যায় না। আর আমাদের গাড়ি কে দেবে। দাঁড়া দেখি গেছোর ভ্যানটা যদি বাগাতে পারি।" গনশার কথা শেষ হতেই পরেশবাবু জানতে চাইলেন, "কার কি হয়েছে রে?" গনশা বলল, "ওই যে স্যার, বাঁকা কাকা আছে না, সরি সরি বংশী কাকার শ্বাসকষ্ট বেড়েছে। অক্সিজেন আনতে হবে, কিন্তু সাইকেলে আনবো কি করে? পরেশবাবু বললেন, "তোরা গাড়ি চালাতে পারিস?" রাজু একেবারে লাফিয়ে উঠে বলল, "গাড়ি কি বলেন স্যার, দরকার পড়লে পেলেন চালিয়ে দেবো। কিন্তু দিচ্ছে কে?" পরেশবাবু নিমেষের মধ্যে ঘরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এসে

একটা গাড়ির চাবি মেঝেতে রাখলেন, "প্রশান্তর গাড়িটা নিচেই আছে, নিয়ে যাস। আপাতত তোদের কাছেই রাখিস, তোদের কাজে লাগবে।" বলেই ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ওরাও চাবিটা নিয়ে চলে গেল যেমন হৈ হৈ করে এসেছিল তেমনই। করবীদেবী ঘরে ঢুকে দেখলেন পরেশবাবু ছেলের মালা পরানো ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। উনি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই পাহাড়ের মতো শক্ত মানুষটা একদম ঝর্ণার মতো ভেঙে পড়লেন। করবীদেবীর হাতটা জড়িয়ে ধরে বললেন, "করবী, আমরা পরিনি আমাদের প্রশান্তকে বাঁচাতে এই রোগের হাত থেকে কারণ আমরা ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা পারবে, ওরা পারবে দেখো। ওরা ভয় পায় না। প্রশান্তর গাড়ির চাবিটা তাইতো ওদের দিলাম যাতে আর কোনো প্রশান্তকে প্রাণ না হারাতে হয় এই করোনায়। বলো ভালো করিনি, ভালো করিনি।"

গ্রথিত ■ চৈতালী রায়

সৌমির ছেলে অনি অসুস্থ হয়ে অ্যাপোলোতে ভর্তি। কয়েকদিন খুব টেনশনে কেটেছে। আজ অনেকটা থিতু হয়েছে। হয়তো দিন তিন চারেকের মধ্যে ছুটি দিয়ে দেবেন। আজ কিছুটা হাল্কা লাগছে। সৌমি বেরোতে গিয়ে দেখলো ওর দাদা অরিনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে এসেছে ওরই এক দাদা, বৌদি, আরো কয়েকজন নিজেদের মানুষ। সৌমিরা একভাই, একবোন। জ্যাঠা, কাকা মিলিয়ে আরো কয়েকজন ভাই-বোন আছে।

গত রাতে, সকালে ওর রক্তবমি; মলদ্বার দিয়ে অনেক রক্ত বেরিয়েছে। মুর্শিদাবাদ থেকে এসে ওর অবস্থা এখন যথেষ্ট সঙ্কটজনক। সৌমি দৌড়ে গিয়ে ওর ছেলেকে যিনি দেখছেন - তাঁকে ডেকে এনে দেখিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করলো। কয়েকদিনের যাতায়াতে ও নিজেও কিছুটা স্বচ্ছন্দ হয়েছে। অরিন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করে। লিভার জনিত সমস্যা যেন ওদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। অরিনের মা, দিদা দুজনেই অল্পবয়সে

লিভার ক্যানসারে মারা গেছেন। মায়ের মামা লিভার সিরোসিসে মারা যান।

সৌমি ঘরে-বাইরে সমান পরিশ্রম করে। ওর স্বামী কৌশিক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ফলতঃ ঘরের কাজে বিশেষ সময় পায় না। ছেলেমেয়েকে স্কুল, কলেজ, টিউশনিতে পৌঁছে দিতে নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে। দৃঢ়চেতা, সবকিছুরই শেষ দেখে ছাড়বো - এমন স্বভাব। ভয় পেয়ে দুশ্চিন্তা করা ওর ধাতে নেই।

সৌমি বৌদিকে নিয়ে বাড়ি ফিরলো। অরিনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। হিমোগ্লোবিন তিনে নেমেছে। রক্ত চালু হয়েছে। একটু থিতু হওয়ার জন্য আরো রক্তের দরকার। সৌমির মাথায় চেপে বসলো – দাদাকে সুস্থ করে তুলতে হবে। এর জন্য যা করণীয় সব করতে হবে। হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী ডোনার না পেলে রক্ত দেওয়া যাবে না। সৌমি হন্যে হয়ে রক্ত জোগাড় করতে লাগলো।

অরিনের ডায়াগনোসিস হলো লিভার সিরোসিস। সত্তর শতাংশ বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ লিভার প্রতিস্থাপন দরকার। ডোনারের জন্য অপেক্ষা করতে গেলে যে সময় লাগবে – অরিনের চিকিৎসায় তা সম্ভব নয়। ডাক্তার বললেন – একমাসের মধ্যেই অপারেশন করতে হবে। এই অপেক্ষাটুকুর জন্য লিভারটা বাঁধতে হবে। লিভার বাঁধা হলো। ডাক্তার বললেন, পেশেন্ট নিয়ে বাড়ি যান, ডোনার জোগাড় করুন, কাগজপত্র রেডি করুন।

সমস্যা সামনে আসলে সৌমি যেন আরো সাহসী হয়ে ওঠে। একদিকে বিরাট অঙ্কের টাকা, লিভারের ডোনার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্তের দরকার। ডাক্তার বললেন – নিজেদের মধ্যে দেখুন। অরিনের বৌ মীনাক্ষীর সুগার, বড় মেয়ের বয়স আঠারো ছোঁয়নি। সৌমি বললো, আমি লিভার দেবো, এর জন্য আমার যা প্রয়োজন পরীক্ষা করুন। সৌমি বাড়ি ফিরে কৌশিক, ছেলেমেয়ে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বোঝালো – ডাক্তারবাবু যেভাবে ওকে বুঝিয়েছিলেন – কাটা অংশ থেকে লিভার আবার তৈরি হয়ে যায়, সেভাবে। কৌশিক যথেষ্ট ভীত। এর মধ্যে খবর এলো অরিনের লিভারের সেলাই ছিঁড়ে গিয়ে আগের মতো রক্তপাত হয়েছে। আবারও রক্ত লাগবে এবং বাঁধনের প্রয়োজন। সৌমি এবার দাঁতে দাঁত চিপে লড়াইয়ে নামলো। একটাই লক্ষ্য অরিনকে বাঁচাতে হবে – তার জন্য যা করার দরকার তা করতে হবে। বাড়ির সকলে ভয় পাচ্ছে, ভয় নেই শুধু সৌমির।

প্রতিটি পরীক্ষার পর ও ঈশ্বরকে স্মরণ করে – এটা যেন মিলে যায়। যাবতীয় পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবুরা সবুজ সংকেত দিলেন। এবার কাগজপত্র প্রস্তুত করার পালা। সৌমি ভেবে পাচ্ছে না, স্বেচ্ছায় আমি আমার দাদাকে লিভার দেবো, তাতে এত ধরনের জটিলতা কেন! একটা করে দিন যাচ্ছে – সৌমি অস্থির হয়ে উঠছে। সকালে বেরিয়ে

ফিরতে কোন কোন দিন সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কাগজপত্রের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হচ্ছে। স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন - না জোর করে নিচ্ছে, বিনিময়ে কিছু দিচ্ছে কিনা – হাজারো প্রশ্ন। যাই হোক টানা প্রায় মাস খানেকের ব্যস্ততায় সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত হলো। টাকা পয়সার জোগাড় হলো, এবার রক্ত জোগাড়। ওর এক ভাই দিব্যকে দায়িত্ব দিলো। দিব্য সরকারি হাসপাতালে কর্ম্মরত।

অপারেশনের আগের দিনেও সারাটা দিন দৌড়াদৌড়ি করে ঘরের এবং বাইরের সমস্ত কাজ গুছিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ভাই বোন ভর্তি হলো হাসপাতালে। সৌমিকে ভয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে বলছে – আমি অজ্ঞান থাকবো, কিছুই টের পাবো না। সুতরাং ভয় কেন পাবো?

ভোর হওয়ার আগেই ঘুম ভাঙলো। হাতে স্যালাইনের চ্যানেল করে দিলো। এরপর ভালো করে স্নান করার নির্দেশ দিলো। ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, আপনি ভয় পেলে আমরা আপনার পেট কাটার পরে বুঝতে পারবো, সেক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ সেলাই করে দেবো। আপনার দাদার লিভার প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে না। পরে বুঝেছে শক্ত থাকার জন্যই ডাক্তারবাবুরা তা বলেছিলেন।

সকাল সাড়ে ছ'টায় ওকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানো হলো। এদিকে অরিনকে তখন প্রস্তুত করছে, স্নান সেরে অপারেশনের পোশাক পরে স্যালাইন চালু করে সকাল সাড়ে সাতটায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেলো। বাইরে তখন কৌশিক, ছেলে, মেয়ে নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে। পাশে মীনাক্ষী, দিব্য, আরো কয়েকজন আত্মীয় দুরুদুরু বুকে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলো। দূরের আত্মীয়দের ফোনে জানানো হলো। সকলেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে কাতর প্রার্থনা করছে – দুটো জীবনকেই ফিরিয়ে দাও। ওদের বয়স কম, সংসারগুলো ভেসে না যায়। সকলেই যেন নিজেদের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। দেখতে দেখতে দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেলো। সকলে মোবাইল আঁকড়ে আছে। বিকেলের পর থেকে ঘড়ি যেন দৌড়চ্ছে – সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ অপারেশন শেষ হওয়ার খবর আসছে না। সন্ধ্যো সাড়ে সাতটার সময় খবর এলো – সৌমির অপারেশন সফল হয়েছে। ওর নিজের এখন লিভার আছে তিরিশ পার্সেন্ট। সকলে একটু আশ্বস্ত হলো। কিন্তু অরিনের অপারেশন আর কতক্ষণ হবে! ওকে এক ঘণ্টা পরে ঢুকিয়েছে – তাহলে সাড়ে আটটা, খুব বেশি হলে ন'টায় শেষ হবে; অনেকেই হিসাব করছে এভাবে মনে মনে। ন'টা বেজে যাওয়ার পরে সকলের হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে। নড়াচড়া না করে মুঠোফোনের দিকে তাকিয়ে আছে – কখন আলো জ্বলে উঠবে – খবর আসবে অপারেশন সফল হয়েছে। দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে সকলে একবুক নিঃশ্বাস নিয়ে শুনলো অরিনকে

ভেন্টিলেটারে রাখা হয়েছে। আগামী তিন দিন ওখানেই থাকবে।

ওদিকে সৌমির জ্ঞান আসার সাথে সাথে প্রথম প্রশ্ন — আমার দাদার অপারেশন ঠিক হয়েছে তো? ডাক্তার, নার্সদের নিজেদের অজান্তেই চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল নেমে এলো। নিজের অতখানি কাটার যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেও দাদার কথা ভাবছে।

দশদিন পর সৌমি এবং প্রায় মাসখানেক পর অরিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলো। বাড়ি ফিরে দু'জনে দু'জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো — একজনের হাতের ওপর অন্যজন হাত রাখলো। যেন বলতে চাইলো — আমরা এভাবেই বাকি পথটুকু হাঁটবো।

এই বিশাল কর্মকাণ্ডের কারিগর হয়েও সৌমির আজ এতটুকুও ক্লান্তি লাগছে না — যেমন অপারেশনের আগের দিন হাসপাতালে পৌঁছনোর পর ডাক্তারবাবুরা যখন বলেছিলেন — আপনার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত ছিল — সৌমি হেসে বলেছিল — সে আর পেলাম কোথায়! আপনারা কাগজপত্রের জন্য যা ছোটাছুটি করালেন। অপারেশনের পরই তো অনেক বিশ্রাম পাবো।

সৌমি স্বর্গতঃ বাবা, মাকে স্মরণ করে বললো, এভাবেই আমরা একে অন্যের সাথে জুড়ে থাকবো।

সাহসিকা হয়ে ওঠার গল্প ■ সাইয়িদ রফিকুল হক

সুচরিতা চৌধুরী বাসা থেকে বের হয়ে আড়চোখে দেখে বুঝলো, পাড়ার সেই মাস্তান ছেলেটি আজ চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নেই! প্রথমবার দেখে সে যেন নিজের চোখ দুটোকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই, সে আর-একবার দেখে নিয়ে একেবারে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হলো যে, মাস্তানটি আজ সেখানে নেই। তার চোখেমুখে অদ্ভুত এক আনন্দ ফুটে উঠলো। এই মুহূর্তে নিজেকে তার দুনিয়ার সবচেয়ে সুখি একটা মেয়ে মনে হলো।

সে মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার কাছাকাছি চলে এলো। তারপর একটা রিকশা নিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে রওনা হলো। আজ সে মনের আনন্দে শপিং করতে পারবে।

আর দুই-তিনদিন পরেই দুর্গাপূজা শুরু হবে। আজ সে সবার জন্য শপিং করতে বের হয়েছে। সবাই বলতে – তার বাবা-মা আর ছোট একটা বোনের জন্য। তাদের ছোট পরিবার।

সুচরিতা চাকরি করে একটা সরকারি অফিসে। মাসখানেক হলো সে অফিসার পদে প্রমোশনও পেয়েছে। এই দিনটির অপেক্ষায়ই এতদিন সে ছিল। এবার সে বাবা-মায়ের দেখেশুনে পছন্দ করা ছেলেকে বিয়ে করবে। কিন্তু পাড়ার এই মাস্তান–মুসলমান ছেলেটি কিছুদিন হলো তার দু'চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাকে দেখলেই সে গায়ে পড়ে হাসে, কথা বলার চেষ্টা করে। এমনকি প্রেম নিবেদনের চেষ্টাও করে থাকে। কিন্তু সুচরিতা বারবার নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। গত কয়েকদিন সে একেবারে মরিয়া হয়ে সুচরিতার পিছনে লেগেছিল। একেবারে কাঁঠালের আঠার মতো। এটা দেখে সুচরিতার মনমেজাজ দুটোই একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আর সে ভয়ও পেয়েছিল খুব!

সুচরিতার বয়স মাত্র ছাব্বিশ। ছেলেটি সুচরিতার চেয়ে কমপক্ষে আট-দশ বছরের বড় হবে। আর তাদের ধর্মও আলাদা। তবুও ছেলেটি তার পিছু ছাড়ছে না দেখে সে ভয়ানকভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আজ তাকে পাড়ার এই চায়ের দোকানটাতে না দেখে সে মাস ছয়েকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে।

সে মনের আনন্দে শপিং শেষ করে বাসায় ফিরছিল। হঠাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে চালককে রিকশাটাকে চায়ের দোকানের সামনে একটু ধীরগতিতে চালাতে বলে আড়চোখে দেখলো – ছেলেটি আবার এখানে এসেছে কিনা! কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে সে ভীষণ খুশি হলো। সে যেন আর তার চোখের সামনে কখনো না পড়ে – এজন্য সুচরিতা ঠাকুরের কাছে আপনমনে বিশেষভাবে প্রার্থনা করতে লাগলো।

এই ছয় মাসের মধ্যে এই প্রথম সে ছেলেটিকে দেখতে পায়নি। এতদিন সে গায়েপড়ে তাকে নানাভাবে জ্বালাতন করছিল। সুচরিতা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইতো না। তবুও সে তাকে ছাড়তো না। গায়েপড়ে তার সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করতো। ছেলেটি আগ বাড়িয়ে নিজে থেকে তার পিছু-পিছু এসে তাকে বড়-রাস্তায় এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো। এসব দেখে সুচরিতার ভীষণ রাগ হতো। তবুও সে মুখ ফুটে তাকে কিছুই বলতে পারতো না।

পর-পর আরও দুইদিন ছেলেটিকে না দেখে আজ সকালে অফিসে যাওয়ার সময় সুচরিতা চায়ের দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসা করে বসলো– সেই ছেলেটি আজ এখানে এসেছিল কিনা?

দোকানদার বললো, "না, দিদি। আজ কয়েকদিন হলো সে এখানে আসে না। তবে

শুনেছি– সে হোন্ডা নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলো– বড়সড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট নাকি করেছে। আর সে বেঁচে আছে – না মরে গেছে – তাও জানি না। শুধু শুনেছিলাম – আয়েশা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছে।"

"ওনার নামটা কি জানেন?" সুচরিতা আবার জানতে চাইলো।

সুচরিতা ওর একটা নাম অবশ্য জানে। তবুও সে এব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত হতে চায়।

দোকানদার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, "নাম মনে হয় ইদ্রিস। ওর এক বন্ধু গত পরশু এখানে সিগারেট কিনতে এসে এটাই বলেছিল!"

সুচরিতা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা রিকশা নেওয়ার জন্য হাঁটতে লাগলো।

মানুষের বিপদে কষ্ট পেতে হয়। কারও দুঃখে আনন্দিত হতে হয় না। কিন্তু এমন একটা দুঃসংবাদে সুচরিতা একদিক দিয়ে খুশিই হলো। তবে সে জানে, এই ধরনের লোকগুলো সহজে মরে না। এরা মানুষকে জ্বালিয়ে খায়।

এদিকে পূজার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আর পূজার তিন-চারদিন পরেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। এই ছেলেটি তখন তো বাগড়া দিতে পারে!

সে আবার আতঙ্কিত হয়ে উঠলো।

তারপর সে অফিসের দিকে বেরিয়ে পড়ে।

সুচরিতা সন্ধ্যার বেশ খানিকটা আগে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তারপর সে নিউ মার্কেটে গিয়ে একখানা বই খুঁজতে লাগলো, কিন্তু বইখানা সহজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সেও একেবারে নাছোড়বান্দা। এই বইটাই কিনবে সে। শেষমেশ একটা দোকানে সে পেয়ে গেল বইখানা। 'ভালোমানুষের মুছচ্ছবি' নামের বইটা দোকানি তাকে প্যাকেট করে দিলো।

সে আবার বেরিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে সে কল্যাণপুরের কাছে আয়েশা ক্লিনিকের সামনে এসে নামলো। তারপর ক্লিনিকের অনুসন্ধান কক্ষে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো ইদ্রিস নামে একজন তিনদিন আগে এখানে সাধারণ ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছে।

সে বেড-নাম্বার জেনে তিনতলায় উঠে এলো। তারপর বেশ সাহস সঞ্চয় করে পুরুষদের ওয়ার্ডেও ঢুকে পড়লো। সে মনে মনে ভেবেছে, একটু সাহস করতেই হবে। এই একটা কৌশলে কাজও হতে পারে। এতে সাপও মরবে আর লাঠিও না ভাঙবে!

সে দেখলো, তেরো-নম্বর বেডে শুয়ে আছে এলাকার প্রভাবশালী মাস্তান ইদ্রিস। তার আশেপাশে এইসময় কেউই নেই! সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

তবে একটা মহিলা বসে আছে তার মাথার কাছে।

সুচরিতা বুঝলো, ইনি ইদ্রিসের মা।

সুচরিতা হঠাৎ আদাব বলে সামনে দাঁড়াতেই ইদ্রিস চোখ খুলে তাকালো। আর সে সুচরিতাকে সামনে দেখে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো যেন! কিন্তু সে উল্টাপাল্টা কিছু ভাবার বা বলার আগেই সুচরিতা তাকে দাদা বলে সম্বোধন করে ফেললো। তারপর সে বেশ সাহসের সঙ্গে বললো, "দাদা, আপনার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে দেখতে এলাম। আমরা একই পাড়ায় থাকি। আপনি তো আমার বড়দাদার মতো। আমরা মাত্র দুটি বোন। আমাদের কোনো ভাই নেই। আজ থেকে আপনাকে আমরা দাদা বলে ডাকতে চাই। যদি আপনি রাজী থাকেন তো...।"

ওর কথা শুনে ইদ্রিস মন খারাপ করে। কিছুক্ষণ ফাটা বেলুনের মতো চুপসে থেকে শেষে বললো, "ঠিক আছে। বসো-বসো।"

তারপর সে পাশের মহিলাকে দেখিয়ে বললো, "উনি আমার মা।"

সুচরিতা হেসে বলে, "সে আমি আগেই বুঝেছি।"

তারপর সে মহিলাকে মাসিমা ডেকে অল্প সময়ের মধ্যে তাকে আপন করে নিলো।

সাধারণ ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে আসার সময় সে বইখানা ইদ্রিসের মাথার পাশে রেখে বললো, "দাদা বইখানা পড়বেন। আপনার মন ভালো হয়ে উঠবে। শরীরও ভালো হবে। আমি আজ আসি। আবার একদিন এসে দেখা করে যাবো।"

ইদ্রিস এবার একটু হেসে বললো, "পড়বো। পড়বো। তুমি দিয়েছো। অনেকদিন বইটই পড়ি না। এবার থেকে পড়বো। এখানে, আমাকে মাসখানের শুয়ে থাকতে হবে। তুমি যে বড়-বই দিয়েছো– তাতে এটা পড়ে মাস কাবার করে দিতে পারবো।"

সুচরিতা হেসে বলে, "সেইজন্যই তো বড়সড় একটা বই দিয়েছি। যাতে আপনি অবসরে এটা পড়ে মনটাকে ভালো রাখতে পারেন।"

সুচরিতা আবার একটু থমকে দাঁড়িয়ে ইদ্রিসের মায়ের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, "মাসি-মা, দাদা সুস্থ হয়ে উঠলে– ভালো দেখে একটা মেয়ে দেখে ওর বিয়ে দিবেন। তাহলে দাদা সংসারি হবে। আর দাদাকে কখনো মোটর-সাইকেল চালাতে দিবেন না।"

সুচরিতার কথা শুনে ওর মা ইদ্রিসের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, "মেয়েটি একেবারে তোর আপন বোনের মতো। ভালো একটা বোন পেয়েছিস। ওর কথা শোন। আর কখনো মোটর-সাইকেল চালাবি না।"

ইদ্রিস ছলছল চোখে চুপ করে রইলো। 'ভালোমানুষের মুখচ্ছবি' এখন তার হাতে ধরা!

রিকশায় চড়ে খুশিমনে বাসায় ফিরছিল সুচরিতা। তার মাথার ওপরে এখন শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশ।

হেমন্তিকার প্রেম ■ উৎস ভট্টাচার্য

শরৎ প্রাণখোলা দিলদরিয়া প্রকৃতির ছেলে। তার নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের আয়োজনে নিত্যদিনের গতানুগতিক জীবনের সুখদুঃখ তেমন ভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। শরতের সেই আনন্দের উদযাপনে কিন্তু অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, পরিবর্তে রয়েছে এক নিরাভরণ আত্মস্থতা! তার সরল আনন্দপ্রবণ মন অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকেই ঠিক খুঁজে নিতে জানে ভালো থাকার রসদ। কখনো সে শিউলি ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে উঠে, নীলাকাশের শ্বেতশুভ্র ভেলায় চড়ে, পাড়ি জমায় অজানার সন্ধানে; আবার কখনো সারি সারি কাশের মাঝেই আত্মবিস্মৃত হয় সে। কখনো আবার আপাত অকারণেই, তার মনসায়রে সুখসরোজ সহস্র পাপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে! এরকম ভাবেই আত্মভোলা শিল্পী সত্তার শরৎ সর্বদাই তার নিজের সৃষ্ট জগতেই বিচরণ করে। বৈষয়িক জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা তাকে ভাবিত করে না কখনোই-- পারস্পরিক এক অলিখিত চুক্তিতে যেন একে অপরকে সযত্নে এড়িয়েই চলে তারা!

হেমন্তিকা দারুণ রূপসী, লাবণ্যময়ী – কিন্তু তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য কোনো এক আসন্ন অমঙ্গলের অব্যক্ত আশঙ্কায় যেন সর্বদাই সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। আড়ালে আবডালে আত্মগোপনের ছল খোঁজে সে নিরন্তর! তবু দেখবার মত চোখ ঠিক চিনে নেয়, পথের পাশের অকিঞ্চিৎকর নবীন কিশলয়ে উপর, রোদ পড়ে মুক্তোর মত ঝলমল করতে থাকা শিশির সদৃশ, হেমন্তিকার অনিন্দ্যসুন্দর রূপমাধুরী। বলাই বাহুল্য সেই সুযোগ্য নয়নযুগলের অধিকীরা শরৎ ভিন্ন আর কেউ নয়! প্রথম দিকের শব্দহীন নির্নিমেষ চেয়ে থাকা অব্যক্ত অনুভূতিরা, ক্রমশ ভাষা খুঁজে পেতে থাকে। চিরকালীন অভ্যাসের মনন-অবগুন্ঠন উন্মোচিত হতে থাকে ধীরে ধীরে। প্রাণচঞ্চল শরৎ আর গহীনমনা হেমন্তিকা আসতে থাকে একে অপরের কাছাকাছি। গন্ধরাজ, দেবকাঞ্চনের সৌরভে সুরভিত হয়ে ওঠে হেমন্তিকার অন্তরাত্মা। হেমন্তিকার সাদাকালো নিস্তরঙ্গ জীবনে লাগে বিচিত্র বর্ণময়তার মিষ্টি ছোঁয়া। নতুন খাদ্যশস্যের সমাহারে গোলা ভরে উঠলে যেমন গাঁয়ের ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল জাগে, তেমনই এক অপূর্ব পরিপূর্ণতায় ভরে ওঠে হেমন্তিকার মন। সে চায় শরতের মনের উৎসবের যোগ্য অংশীদার হয়ে উঠতে – বিষণ্ণতাকে চিরবিদায় জানাতে। কিছুটা সফলও হয় হেমন্তিকা, কিন্তু ফল্গুধারার মত তার মনের মাঝে গোপনে প্রবাহমান থাকে এক বিষাদময় অনুভূতি – এত যে সুখ, তাকেই হারিয়ে ফেলার শঙ্কা।

হায় রে জাগতিক নিয়মতান্ত্রিকতা! শরৎ-হেমন্তিকার সেই সুখস্বপ্নের দিনগুলো দীর্ঘস্থায়ী হল না। হেমন্তিকার বাবা দিবাকরবাবু প্রকৃতিগত ভাবে খুবই তেজস্বী ও রাশভারী। সঙ্গত কারণেই চালচুলোহীন বাউণ্ডুলে শরতের সাথে হেমন্তিকার

মেলামেশা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি তিনি। তাই সর্বতভাবে যোগ্যতম হিসেবে তিনি শৈত্যপ্রকাশ'কে চিহ্নিত করেন। শৈত্য স্থিতধী, বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন, সুপ্রতিষ্ঠিত মধ্যবয়স্ক। শৈত্যের মধ্যে আবেগ অনুভূতি বাহুল্য নেই, নেই প্রাণপ্রাচুর্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশও। কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা মগজ তার। বিপদে বিচলিত হয় না কখনো; স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রসারে সদাই নিয়োজিত তার সেই হিমশীতল মস্তিষ্ক। এরকম পাত্রই হেমন্তিকার জন্য উপযুক্ত বই কি! অন্তত দিবাকরবাবুর তেমনটাই সিদ্ধান্ত। তাঁর উপরে কথা বলবার মত মনের জোর ছিলো না হেমন্তিকার। ফলে এতদিন যে আশঙ্কা মনের মাঝে ছিলো হেমন্তিকার, তার বাস্তবায়ন ঘটলো এবারে। সে সামান্যতম প্রতিবাদও করতে পারলো না, কারণ সে তো জানেই শরৎ শিল্পী সত্তা ও প্রেমিক সত্তার অধিকারী হলেও ন্যূনতম বাস্তববোধের অধিকারী নয় – আর হবেও না কোনদিন! মনের বেদনা মনেই চেপে রেখে, সময়ের একমুখী অভিঘাতে শৈত্যপ্রকাশের দিকেই এগিয়ে যেতে হয় হেমন্তিকা'কে।

শৈত্যপ্রকাশের কাছে আবেগ অনুভূতির আবেদন আশা করা সোনার পাথরবাটির মত বিষয়! তাই কাঙ্খিত উষ্ণতার বড়ই অভাব একাকিনী হেমন্তিকার নিঃসঙ্গ জীবনে। কখনো পড়ন্তবেলার মনখারাপ করা আলো দেখে হেমন্তিকা মনে মনেই ফিরে যায় সেই সুখের স্বপ্নমাখা দিনগুলিতে। পুরোনোদিনের স্মৃতিমাখা দখিনা বাতাস কখনো বা বয়ে আনে শিউলিফুলের গন্ধ!

শরৎও আর আগের মত নেই। তার আনন্দের আয়োজনে মাঝেমধ্যেই ভাঁটা পড়ে আজকাল। তার মনে স্বচ্ছ নীলাকাশে আগে পেঁজাতুলোর মত শ্বেতশুভ্র মেঘরাজি ভাসতো, আর এখন? এখন প্রায়সই ঘন কৃষ্ণবর্ণের মেঘ জমে শরতের মনে। অকালে অবিরত বর্ষণ হয়ে ঝরে পড়ে তার অব্যক্ত দুঃখগুলো।

কিন্তু সময় থেমে থাকে না। আবারো কোন হেমন্তিকার প্রেমে পড়ে অন্য কোন শরৎ। চক্রাকারে আবর্তিত হয় সেই বেদনাময় "না-মানুষ" প্রেমগাথা। শরৎ আর হেমন্তিকার প্রেমগাথা কি কখনো সম্পূর্ণতা পাবে? তা বোধ হয় সম্ভব হবে না কখনোই, কারণ বিধাতার নিঠুর পরিহাসে শরৎ আর হেমন্তিকার একাত্মতা আর সৃষ্টির নাশ সমার্থক হয়ে গেছে! মিলন-বিরহের এই চক্রাকার পরিণতি অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকবে – যতদিন না বিনাশকাল সমাগত হয়, সেই বিনাশের মহালগ্নে বুঝি পূর্ণতা পাবে এক মহাজাগতিক অসম্পূর্ণ প্রেমগাথা! অশ্রুজল চোখে খেলে যাবে খুশির ঝিলিক, শুষ্ক ওষ্ঠে ফুটে উঠবে মৃদু হাসি। কেবল আমরা কেউ তার সাক্ষী থাকবো না। নাই বা থাকলাম – নিভৃতেই হোক হৈমন্তিক প্রেমযাপন!

তর্পণ ■ রঞ্জন ব্যানার্জী

আজ একবছর ধরে মাকে কতো খুঁজেছি। কোথাও খুঁজে পাইনি। মায়ের ছবির সামনে দিনরাত চুপ করে বসে থেকেছি। আবার মনে মনে বলেছি মা একটিবার দেখা দাও। খুব মনখারাপ লাগছে। তুমি কোথায় গেছো। একা একা আমার ভালো লাগছে না। খুব ভেঙে পড়েছি। আসলে মা-ই ছিলো আমার জীবন। আমি পঙ্গু। খুব বেশিদূর যেতে পারিনা। মা আর আমি থাকতাম। মা ও বই ছিলো আমার নিত্যসঙ্গী। বিভিন্ন বই পড়ে আধ্যাত্মিক উপায়ে, প্ল্যানচেট করেও মাকে আনার চেষ্টা করেছি। মা আসেনি। ক্রমে ক্রমে মনটা ভেঙে যেতে লাগলো। মা কি তবে চিরদিনের জন্য চলে গেলো। এক সকালে আমার ঘুম ভাঙলো, কিন্তু মায়ের ভাঙলো না। রোজ বাড়ির সামনে মায়ের হাতে লাগানো কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। মা মারা যাবার তেরাত্রের দিন লোকে বলেছিলো মায়ের আত্মা এসে জল খেয়ে যাবে। আমিও সেইমতো শ্মশান থেকে ফেরার পর একঘটি জল এনে আমার বিছানার পাশে রেখেছিলাম। যদি মা এসে জল খেয়ে যায়। কিন্তু মা আসেনি। সবাই নিষেধ করেছিল জলটা ঘরে না রাখতে। আমি শুনিনি। কেনই বা শুনবো। আমি তো মাকেই খুঁজছি। শ্রাদ্ধের সময়ও সবাই বলেছিলো ভালো করে লক্ষ্য করবি তোর মা ঠিক আসবে তোর হাতে পিণ্ড গ্রহণ করবে বলে। কিন্তু আমি খেয়াল করে দেখেছি মা তাও এলোনা। শুধু একটা দোয়েল পাখি কৃষ্ণচূড়ার ডালে বসে যতক্ষণ শ্রাদ্ধের কাজ চলেছিলো ততক্ষণ বসেছিলো। আমি খেয়াল করিনি। একজন ইশারা করে দেখাতেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম গাছতলায়। কিন্তু ততক্ষণে পাখি উড়ে গিয়েছিলো। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। এক মহাপুরুষের লেখা পড়ে জানতে পারলাম সাধকরা কয়েক লক্ষবার মাতৃনাম জপ করে মায়ের দর্শন পায়। আমিও শুরু করলাম কিন্তু কত যে লক্ষবার হয়ে গেলো কিন্তু তবুও মা এলো না। রোজ কাঁদি। তবে কি এজন্মে আর মাকে দেখতে পাবো না।

আজ ভোর ভোর উঠলাম। আজ তো মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসান আর মাতৃপক্ষের সূচনা। সবাই বলে পূর্বপুরুষেরা নাকি ওইদিন বংশধরের হাত থেকে জল খেতে পৃথিবীতে আসে। তাহলে তো আমার মাও আসবে। মাকে আবার আমি দেখতে পাবো। তর্পণের মাধ্যমে জল দেবো। আমি তো পঙ্গু তাই গঙ্গা বা নদীতে যেতে পারবো না। তাতে কি হয়েছে। আমি আমার মতো তর্পণ করে মাকে জল দেবো। ভোর ভোর উঠে স্নান সেরে মায়ের প্রিয় ঘটিটা করে এক ঘটি জল নিয়ে কৃষ্ণচূড়ার তলায় এলাম। সবেমাত্র পূবদিক রাঙা হয়ে উঠেছে। এটাই ব্রাহ্ম মুহূর্ত। আমি চোখ বন্ধ করে জলটা গাছের গোড়ায় ঢাললাম। মাকে বললাম মা তুমি এসে জল গ্রহণ করো। এটাই আমার জলতর্পণ।

অপর একটা ঘটিতে করে জল এনে গাছের গোড়ায় রেখে চোখ বন্ধ করে মাকে ডাকতে থাকলাম। ভোরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মনে হলো কেউ আমার ঘটির জল থেকে ঢকঢক করে আওয়াজ করে জল খাচ্ছে। মনটা আনন্দে ভরে উঠলো। আমার মা তাহলে এসে গেছে। ভাবছি চোখ খুলবো কিনা। মনের ইচ্ছে চেপে রাখতে পারলাম না। চোখ খুললাম। দেখি মা কোথায়। ঘটিতে বসে দোয়েল পাখিটা জল খাচ্ছে। আর এক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। চোখ বন্ধ করলাম। আবার সেই ঢকঢক শব্দে জল খাওয়ার আওয়াজ। আর চোখ খুললাম না। মা আমার তর্পণের জল গ্রহণ করেছে। আমি চোখ বন্ধ করে শুধু মাকেই ডেকে যাচ্ছিলাম। আমার চোখের জল গাল বেয়ে আমার না পাওয়া মনের ইচ্ছেকে ভিজিয়ে দিতে দিতে বয়ে যেতে লাগলো। আমি শুধু কাঁদতে কাঁদতে মায়ের জল খাওয়ার আওয়াজ শুনতে লাগলাম।

ভ্যালেন্সডাইন ডে ■ তরুনার্ক লাহা

ব্যাগ হাতে জীবনবাবু বাজার থেকে ফিরেই হাঁক পাড়েন – নীলু, বাজারটা নিয়ে যাও।

কাজের মেয়ে মিনি বেরিয়ে আসে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে – জ্যাঠু কাকে ডাকছ?

জীবনবাবুর খেয়াল হয় তার আদরের নীলু একবছর হল তার বাড়িতে থাকে না। ঝগড়া করে বেরিয়ে গেছে। পাড়াতেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকে নীলিমা। মাঝে মধ্যে পথে ঘাটে দেখা হয় ঠিকই। কিন্তু মুখোমুখি হওয়ার আগেই নীলিমা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

জীবনবাবুর বুকের মাঝখানটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবেন - কি এমন অপরাধ করেছেন যে তার এরকম শাস্তি? মনে মনে তিনিও ঠিক করেন নীলিমার কাছে কিছুতেই নত হবেন না। কিন্তু নীলিমাকে দেখলেই ঠিক থাকতে পারেন না।

ছেলে বিপ্লব দিল্লিতে কর্মরত। মা বাবাকে কতোবার বলেছে ঝগড়াঝাটি মিটিয়ে নিতে। লাভ হয় নি কিছুই। বিপ্লব এবার হুঁসিয়ারি দিয়েছে – তারা একসাথে না থাকলে আর কথাই বলবে না।

জীবনবাবু চেয়ারে বসে সকালের বাসি কাগজগুলো আর একবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন। মনটা ভালো নেই আজ। মুখটাও কেমন তেতো তেতো লাগছে। একটু চা হলে ... মিনিকে হাঁক পাড়েন — মি.....নি, এক কাপ চা দিয়ে যা।

রান্নাঘর থেকে জবাব আসে – যাই জ্যেঠুমণি।

চা এসে গেছে। জীবনবাবু কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বলেন – এখানে রাখ।

টি টেবিলে চা রাখতেই জীবনবাবুর চোখে পড়ে হাতে শাঁখা পরা একখানি সুন্দর হাত।

চমকে পিছন ফিরেই হতবাক - তার নীলিমা দাঁড়িয়ে। মুখে সেই অনাবিল মিষ্টি হাসি। সামনে এসে নীলিমা বলে – চমকে গেলে বুঝি?

জীবনবাবু তখনো হাঁ হয়ে থাকেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মুখে কথা সরছে না।

নীলিমা নিজেকে গুছিয়ে বলে – তোমার নীলু ফিরে এল। কিছু বলবে না?

জীবনবাবু বিড়বিড় করে বলেন – আমি যে কি খুশি হয়েছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। নীলু, তুমি ছাড়া .....

জীবনবাবুর চোখদুটো ছলছল করে ওঠে। নীলিমা একটা গোলাপ স্বামীর হাতে দিয়ে বলে – আজ ভ্যালেন্সটাইন ডে। মনে আছে এই দিনেই তোমার সাথে আমার প্রথম আলাপ। তার পরের ভ্যালেন্সটাইন ডে তে আমাদের বিয়ে। এত সহজে এই দিনটা ভুলতে পারি? বুড়ো হয়েছি তো কি হয়েছে তুমি সেদিনের মতোই আমার কাছে আমার জীবন হয়ে আছো।

– তাহলে আমাকে ছেড়ে...

– ভুল বুঝেছিলাম। পরমার সাথে কথা বলি। ভেবেছিলাম আমাকে লুকিয়ে ছাত্রীর সাথে... না তোমার কোনো দোষ নেই। আমাদের মধ্যে পাঁচিল তোলার জন্য পরমাই দায়ী।

জীবনবাবু নীলিমার হাতটা চেপে ধরেন। কিছুক্ষণ আগেই জীবনটা পানসে মনে হচ্ছিল। অথচ তার নীলু ফিরে আসতেই ....

গোলাপটা নিয়ে জীবনবাবু স্ত্রীর খোঁপায় গুঁজে দেন। নীলিমার হাতটা বুকের কাছে এনে বলেন – হ্যাপি ভ্যালেন্সটাইন ডে।

মিনি কপাটের আড়াল থেকে এই সুখী দম্পতিকে দেখতে থাকে। মনে মনে সেও বলে – ভালো থাকো গো তোমরা।

বহিরাগত ■ অনুপকুমার আচার্য

আবাসনের গেটে রেণুর সঙ্গে দেখা। মুখোমুখি হতেই হাঁউমাঁউ করে উঠল, আমাকে তোর মতো একটা কাজের বাড়ি জোগাড় করে দে, বাসন্তী। কথা শেষ না করেই বাসন্তীর হাতটা টেনে নিতে চাইল নিজের হাতে। চটপট নিজের হাত সরিয়ে নিল বাসন্তী। দিনকাল বলে কথা!

সারা দেশে কী রোগ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে – ভগবান জানেন। কান পাতলেই খবর আসে – এদিক সেদিক থেকে। সবই কেমন ফিসফাস শব্দে। সব কথা বোঝাও যায় না ঠিকঠাক। মানুষজনের মুখে শুনে শুনে বাসন্তী যা বুঝেছে – 'করুণা' না কি নাম। সেই কোন কালের 'মায়ের দয়া'র মতো মায়ের করুণা।

বাতাসে রোগ ওড়ে। শ্বাসকষ্ট দিয়ে শুরু। তারপর কি হয় – অতশত জানে না বাসন্তী। তবে লোক মরছে টপাটপ। সে খবরও বাতাসে ওড়ে বৈ কি!

ট্রেন বাস বন্ধ। আপিস-কাছারি, ইস্কুল-কলেজ – তাও। হাটবাজার দোকানপাট বাদ যাবে কেন! এই খোলা তো এই বন্ধ। টিভিতে অষ্টপ্রহর কেত্তন। ঘরে থাকো। হাত ধোও। ঘনঘন।

ছেলেবেলায় দেশ-গাঁয়ে দেখা বাছুরের মুখের 'ঠুলি'র মতো মেয়েপুরুষ সবার নাক-মুখ ঢাকা। 'মাস্ক' না কি বলে যা হোক। কারও সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি ঘেঁষাঘেষি চলবে না। হাটবাজার দোকানপাট সবখানে – দূর থেকেই যা কাজকর্ম সারতে হবে। জটলা চলবে না। বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ। যাওয়া-আসাও।

কপাল পুড়ছে তার মতো শহুরে বাবু-বিবির ঘর সংসার আগলে রাখা মানুষজনের। বাইরের কাজের লোক আর রাখতে চাইছেন না বাবুরা। মাইনে পত্তর দিয়ে বিদেয় করছেন কেউ। ভালো মানুষেরা কেউ দু-এক মাসের বাড়তি পয়সাকড়ি দিয়েও পথ দেখাচ্ছেন ইচ্ছেয় হোক অথবা অনিচ্ছেয়। লোকলজ্জার ভয়ে। রেণুর কথা মনে পড়ল বাসন্তীর।

এক পাড়ায় বসত বলে রেণুকে চেনে অনেকদিন। কয়েক বাড়ির ঠিকে কাজের লোক। কোথাও নিষেধ করেছে আগেই। বাকিগুলোও খসে যাবে শিগগির। আঁচ পেয়েছে হয়তো।

গেট পেরিয়ে আবাসনের বিশাল চত্বর। আপিসের সামনে এসে আড়চোখে দেখল বাসন্তী। ঢ্যাঙ্গা মতন লোকটা কঠিন চোখে দেখছে তাকে। মুখের মাস্ক সামান্য ওপরে তুলে পথটা পেরিয়ে এল।

অন্যসময় সাথে আরও একটা লোক থাকে সমিতির। কালো মোটা মতন। পকেটে পান পরাগের পাউচ। কথার ফাঁকে পিচিক পিচিক থুতু ফেলে।

মাসিমার বাড়ি থেকে তাকে উৎখাত করতে কম হুজ্জুতি করেনি দু'টো। এক গোঁ – বাইরের লোক ছেড়ে দিন মাসিমা। রোগটা ছড়াচ্ছে দ্রুত।

একদিন নয়। দিনের পর দিন। নাছোড়বান্দার মতন। কলিংবেলের শব্দে দরজা খুললেই বাসন্তীর মুখের ওপর মাসিমাকে ডেকে নিত্যি এক কথা – মাসিমা সবাই কিন্তু সমিতির কথা মানছে। বাইরের লোক ছেড়ে দিয়েছে। শুধু আপনারা ....

মাসিমা কী বলবেন! অসুস্থ শরীর নিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে পড়তে কি বললেন, শুনতে বয়ে গেছে দু'টোর! উল্টে ফেরার সময়, বাসন্তীকে রক্তচক্ষু মেলে ধমকে যেত – মাস্ক পরো না কেন!

এক কুড়ির বেশি বছরের কাজের বাড়ি। হুট বললেই ছাড়া যায়। মাসিমার দশারও কোন্ স্বপ্নের! সবেধন পেটের ছেলে পড়ে আছে কোন বিভূঁইয়ে। ঘরে বাইরে দু'জন নড়বড়ে। মেসোর মুখে কথা নেই কত বছর হল। সারাদিন এ ঘর ও ঘর করছে। পা চললেও, হাত দুটো অসাড় একরকম। মুখের শব্দে যা বোঝায়, তা মাসিমা আর সে ছাড়া বুঝবে ক'জন!

সে নাহয় এতগুলো বছর কাটিয়ে দিল বলেই না! কাজের কথাটুকু বুঝে নিতে পারে। এমন তো আর ছিল না মানুষটা বরাবর। দিব্যি হাসিখুশি ভালো মানুষ। সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকা আপনভোলা মানুষ। ঘর আর কলেজ করেই দিন কেটে গেল। এমন ভালো মানুষের কপালে কী দুর্গতি!

মাসিমা সেদিক থেকে চলনসই ঠিকই। কিন্তু বাতের সমস্যায় জেরবার তিনিও। নড়তে চড়তে সময় লাগে। বিষব্যথায় কাবু। মুখের রেখায় বিরক্তির বাস সারাক্ষণ। কে বলবে এককালে দাপিয়ে আপিস করেছেন। ছেলেকে মানুষ করেছেন। এখন ঘর সংসার সামলে দু'জনের দু'মুঠো ফুটিয়ে নেওয়া সাধ্যের বাইরে।

ছেলে কোন্ বিদেশে। সে ছাড়া দুই বুড়োবুড়ির ভব সংসারে আর কাউকে দেখেনি বাসন্তী।

এ বাড়িতে প্রথম এসে দাদাবাবুকে ছোটই দেখেছে বাসন্তী। তার বয়সও কম। সেই দাদাবাবুই এখন বিদেশ থেকে আবাসনের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে হামেশা। তার কথাতেই সমিতির বাবুরা বাড়াবাড়ি করেন নি এখনও। বাসন্তী টিকে আছে।

আজ অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তার। ঘরে পা রেখে দেখল, মাসিমা তার অপেক্ষায় ঘরবার করছেন। তাকে দেখে স্বস্তি ফিরল যেন।

দুপুরে পাড়ায় ফিরে বাসন্তী দেখল, গলির মুখ বাঁশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে কেউ। থতমত খেল প্রথমটায়। তারপর বিরক্ত। শুনশান দুপুর। কাছেপিঠে লোকজন নজরে পড়ল না। সামান্য এদিক ওদিক দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখল, অদূরে ঝাঁকড়া আম গাছের ছায়ায় একজন পুলিশ। পাশে হোমগার্ডের মতো উর্দি পরা আরও একজন।

ভরদুপুরে রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে লক্ষ্য করে থাকবে কেউ। এ পাড়ার বাসিন্দা বলে চিনেও থাকতে পারে। তবু এগিয়ে এল না কেউ। দূর থেকে হাত ঘুরিয়ে ইশারা করল একজন। বাসন্তীর নজরে এল, বাঁশের শেষ মাথায় এক চিলতে ফাঁকা জায়গা। একজন মানুষের আসা-যাওয়ার ফোকর।

সারবন্দি ঘরের সামনে দিয়ে এগোতে এগোতে সুদেবের নামটা কানে এল। টনক নড়ল বাসন্তীর। রেণুর স্বামী। হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী। দিনকতক অসুস্থ। হাওয়ায় ভাসতে থাকা খবরটা ঠিকানা পেল এবার। মায়ের করুণা!

ঘরে ঢুকে বাসন্তী দেখল, নদু একমনে মোবাইল ঘাঁটছে। দশ বছরের নাতি এখন সারাক্ষণের সঙ্গী। এক টুকরো স্বপ্ন। জন্মের বছর দুয়েক পর, বাপকে ছেড়ে মা আর এক নাগরের সাথে ঘর বেঁধেছে। পেটের সন্তান নয়। শত্রু। দিনরাত্তির গাল পেড়েছে মঞ্জুকে – এই সেদিনও। সম্পর্ক ছিল না এতকাল। আসা-যাওয়া দূরের কথা!

দুধের ছেলেকে মায়ের জিম্মায় রেখে মুখপুড়ি নতুন সংসার করতে গেল। বাসন্তী অন্ধকার দেখল এক চোখে। অন্য চোখে আলোও।

কম বয়সে স্বামী হারিয়ে মেয়েকে আঁকড়ে দিন কেটেছে। নাতিকে পেয়ে সেই দিন ফিরে এল আর কী! যেন মেয়ের সন্তান নয়, নিজের পেটের।

কোলের নাতিকে নিয়ে কাজে বেরিয়েছে এক সময়। গেছে সে সব দিন। ঘরে রেখে যাওয়া শুরু হল তারপর। পড়শিদের ভরসায় – যখন যেমন। কোনদিন ঘরে ফিরে দেখত, নাতি ঘুমিয়ে কাদা। ঘুম ভাঙ্গিয়ে খাওয়াতে গেলে চিল চিৎকারে পাড়া তটস্থ হয়ে উঠত। খিদেয় কাতর কখনও চোখ কপালে তুলে ঢকঢক গিলত তরল পানীয়। ঘাম রক্তের বদলে পাওয়া চোখ জুড়োনো ছবি। যেন বছর কয়েক আগের মেয়ের ছোটবেলার দিন ফিরে আসত।

নাতিকে নিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ হতে বিকেল। রাস্তার কলে জল এসেছে। হাতমুখ ধুয়ে বাইরে বেরোবার আগেই হইচই কানে এল। কিসের সোরগোল। উঁচু গলায় কথা বলছে কেউ। মেয়েলি স্বর। পুরুষ কণ্ঠ একটি নয়, অন্তত দু'জনের। তাও চড়া নয়। খাদের দিকে। সমঝোতার সুর। কিছু বোঝানোর চেষ্টা। বাইরে আসতেই মেয়েলি কণ্ঠ চেনা গেল। মঞ্জুর গলা।

এতদিন আমল দেয়নি পেটের মেয়েকে। রাগে ঘেন্নায় ঘেঁষতে দেয় নি ত্রিসীমানায়। কিন্তু আর ক'দিন! পেটের শত্তুর বলে কথা।

ক' বছর তো কাটল। নাড়ির টান যাবে কোথায়! ছেলে বড় হচ্ছে। তা ছাড়া, সে তো আর সারাদিন বাড়ি থাকে না! কোন ফাঁকে ছেলের কাছে যাওয়া-আসা শুরু করেছে – কে জানে!

বাসন্তী টের পেয়েছে সবে – ক'দিন আগে কাজ থেকে ফিরে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে মা-ব্যাটার গলা শুনে অবাক। মাথার আগুন জল হতে আর কত সময়!

গলির মুখে এগোল বাসন্তী। যা ভাবা তাই। মঞ্জু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে। ছেলের জন্মদিনে পায়েস করে এনেছে। পুলিশ আটকাবার কে?

নজরদারের লোকজন এখন বেড়েছে। বাগ মানাতে চাইছে মঞ্জুকে। করুণা ঢুকেছে পাড়ায়। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না এখন। সে রকম বলা আছে ওপর থেকে। তাদের হাত-পা বাঁধা।

বাসন্তী মেয়ের হয়ে সাফাই গাইতে যাচ্ছিল। ধমক খেয়ে চুপ করে গেল। ব্যাজার মুখে মঞ্জুর হাত থেকে পায়েসের কৌটো নিতে নিতে বিড়বিড় করল শুধু – মায়ের কাছে মেয়ে কিংবা ছেলের কাছে মা আবার বাইরের লোক হ'ল কবে! অনাচ্ছিষ্টি যতো।

আজ ফের হুজ্জুতি। দাদাবাবু ফোনে সমিতির কত্তাদের বুঝেয়ে সুঝিয়ে রাজি করবার পর ক'দিন শান্ত ছিল। দিব্যি আবাসনে যাওয়া-আসা ছিল। মাসিমা - মেসোবাবুদের চিন্তা ছিল না। বাসন্তীকে দূর থেকে দেখেছে ঢ্যাঙ্গা আর মোটা মতো লোক দু'টো। কখনও দু'জন নয়, একজনই। কিছু বলে নি।

ভেতরে ঢোকার মুখে পথ আটকাল সমিতির আপিসের একজন। নতুন লোক। অচেনা আনমানা বাসন্তী ভ্যাবাচ্যাকা খেল। মুখ তুলে দেখল – এ নতুন লোক। ঢ্যাঙ্গা, মোটা কেউ নয়।

– কোথায় যাবে? বাসন্তীকে আপাদমস্তক জরিপ করা কর্কশ স্বর।

মেসোবাবুর নাম শুনে কোন হোলদোল দেখল না লোকটার মুখে। উল্টে ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করল – কোন ব্লক?

বাসন্তী স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল।

– বাইরের লোক আর ঢুকবে না আজ থেকে। জোরালো দৃষ্টির চোখা শক্ত চোয়াল।

বাসন্তী প্রমাদ গনল। এমনিতে ঘর থেকে বেরোতে দেরি হয়েছে।

কাল রাতে পাড়াতেও ঝামেলা গেছে একচোট। নাতিকে নিয়ে শুতে যাবার আগে থানার লোক ঢুকল পাড়ায়। খুঁজে খুঁজে রেণুর দরজায় লাঠির ঠোকা। নাম ধরে হাঁকডাক।

– রেণু হালদার কে? থানার লোকের মুখে নিজের নাম শুনে ঘুম চটকে গেল রেণুর। কথা বেরোল না হঠাৎ। এত রাতে ঘরে একা মেয়েমানুষ। সুদেব বাড়ি ফেরেনি। রোগ ধরা পড়েছে। হাসপাতাল ছাড়বে কেন? কর্মী বলে কথা!

– আপনাকে যেতে হবে। হুমকি শুনে আরও ঘাবড়ে গেল রেণু।

ততক্ষণে ঘুমের দফরফা। মিনমিন করে বলতে পারল শুধু – কোথায়!

– আমাদের সাথে। হোমরা চোমরা গোছের একজন বলে উঠল। – এখানে থাকা চলবে না। ধমকের সুর ভেসে এল ফের।

পুলিশের গন্ধে লোকজন বেরিয়ে এসেছিল জনাকয়েক। তাদের চাপা উশখুশ। ফিসফিস। শুধু বয়স্ক গোছের একজন বলতে চাইল – এত রাতে একা মেয়েমানুষ...

– সে ভাবনা আমাদের! কথা শেষ হবার আগেই ফের গর্জন।

বাসন্তী দূর থেকে দেখছিল। বেশি মাধবকে। থানার লোকজনের কানে মাঝে মধ্যে নীচু গলায় কিছু না কিছু বলে যাচ্ছিল। পাড়ার নয় তো কী! হাসপাতালে রোগী ভর্তির ধান্দায় হামেশা যাতায়াত সুদেবের কাছে। এ পাড়ার হাঁড়ির খবর তার কাছে।

ভয়ভীতির মধ্যেও মাধবের কীর্তি বাসন্তীর ঠোঁটের আবছা হাসি টিকিয়ে রাখল যেন।

আজকাল কোন কিছুতেই জীবন টাল খায় না। কাল রাতের ঘটনার পরেও কোনো হোলদোল নেই রেল কলোনির হারু মিস্ত্রির গলিতে। সবার মুখে কুলুপ। যে যার ম্যাও সামলাতে ব্যস্ত।

অত রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না বাসন্তীর। সকালে রেণুর মুখটা ভেসে উঠছিল চোখে। পাশে নদু অকাতরে ঘুমোচ্ছে। পরম মমতায় নাতির শরীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভোরের দিকে চোখ বুজে এসেছে কখন – টের পায় নি। উঠতে দেরি হয়ে গেল।

সমিতির আপিসের সামনে দাঁড়িয়ে উশখুশ করছিল বাসন্তী। মনে অস্বস্তি। নতুন লোকটা তাকে চেনে না।

আগের দু'জনকে মনে পড়ল। একজন থাকলে ব্যবস্থা হয়ে যেত। জানে বাসন্তী। একবার ভাবল, তাদের কথা জিজ্ঞেস করবে। সাহস হল না। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! বলা শক্ত।

মাসিমার কথা মনে এল। হুট বলতে নড়াচড়া তাঁর কাজ নয়। মেসোবাবুর ওই দশা। পা চলে তো হাত অচল। মুখের কথা বুঝবে কার সাধ্যি! বাসন্তী ছাড়া চোখে অন্ধকার।

এপাশ ওপাশ দেখছিল বাসন্তী। সত্যি কথা, এখানে ঠিকে লোকের আসা-যাওয়া বন্ধ। তবু সেই... মাসিমাদের জন্যে টিকে আছে।

মেঘলা আকাশে ময়লা রোদের দেখা হঠাৎ। মাসিমার ফ্ল্যাটের ওপর তলার দাদা ঢুকছেন। বাজার ফেরত। চেনা মানুষ। মুখে ঠুলি থাকলেও চিনতে অসুবিধে নেই। কম বয়েস। তবু মাসিমাদের সঙ্গে বেজায় ভাব। দু'জনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। বাসন্তীকেও চেনে।

তাঁকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই হয়তো কাছে এলেন। বাসন্তীর কাছে শুনলেন। তারপর লোকটাকে নিয়ে সমিতির আপিসের দিকে এগোলেন সামান্য। নীচু

গলার কথাবার্তা ধরাছোঁয়ার বাইরে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বাসন্তী। দেবদূতের ইচ্ছেয়।

মাসিমাদের দশা আজ আরও খারাপ। হবেই! অনেক দেরি হয়ে গেছে তার। বাতের ব্যথা বেড়েছে ফের। শুয়ে থেকেই কথা বলছিলেন। বাসন্তীকে যা বলার! মেসোবাবু এঘর ওঘর করছিলেন। অকেজো হাত দু'টো বুকের কাছে নিয়ে। বাসন্তীকে দেখে হাসলেন শুধু। ছেলেমানুষের মতো।

বাসন্তী চটপট কাজে হাত দিল।

আবাসনে রোগ ছড়াচ্ছে ইদানীং। মাসিমা বলছিলেন। সমিতির আপিসের একজনের ধরা পড়েছে নাকি! ঢ্যাঙ্গা অথবা মোটা – কার কে জানে! কাজের ফাঁকে কানে আসছিল তার।

রান্না শেষ হলে মাসিমাকে ডাকল বাসন্তী। ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে ডাইনিংয়ে এলেন। বাসন্তী পাশে।

মেসোবাবু এতক্ষণ ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মাসিমাকে দেখে এসে বসলেন। চেয়ারে নয়। সামান্য নীচু টুলে। তাঁকে বাসন্তী খাইয়ে দেবে।

টুলে বসেও কথা বলছিলেন। সবটা বোঝা না গেলেও। তাঁর এই বয়সটা ছেলেবেলার মতো।

বাসন্তী মুখে খাবার তুলে দিচ্ছিল। সময় নিয়ে চিবোচ্ছিলেন। রসনায় তৃপ্তির ছোঁয়া। চোখে খুশির আলো ছড়িয়ে পড়ছে সারা মুখে। ছোটদের মতো।

নদুর ছোটবেলার কথা মনে পড়ল বাসন্তীর। নাহ্, নদুকে নয়। মেসোবাবুকে খাবার তুলে দিচ্ছে মুখে। বাইরের লোক হ'লেও।

নায়িকা সংবাদ ■ সুনির্মল বসু

ছায়াছন্ন গ্রাম। আঁকা বাঁকা মেঠো পথ। চারিদিকে সবুজের বর্ণময় সমারোহ। পাখির ডাকে এখানে সকাল আসে। রাতে বাঁশবনের ওপর অজস্র তারার মালা। দূর আকাশে ঘুম ঘুম চাঁদ জেগে থাকে। দূরে তাল সুপারি গাছের সারি। সামনে তরমুজ ক্ষেত। কাছেই চলনবিল। বিলের জলে শাপলা শালুক। এপারে ঘাটে বাঁধা নৌকো।

এ গ্রামের ছেলে বিজন মা বাবা মারা যাবার পর মামা বাড়িতে থেকে মানুষ হচ্ছিল। বরাবর পড়াশোনায় গভীর মনোযোগী ও। প্রতিটি পরীক্ষায় ভালো ফল করছিল। এবার তার বিএ ফাইনাল পরীক্ষা দেবার কথা। বিজন মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছিল। পড়াশোনার বাইরে ওর একটা বিশেষ শখ আছে। তা হল, রবি ঠাকুরের গান। বিকেল বেলায় বসন্ত দিনে যখন উদাস হাওয়া কৃষ্ণচূড়া বনে বয়ে যায়, তখন বিজন নদীর পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজের মনে রবি ঠাকুরের গানের কলি গেয়ে ওঠে। কারো কাছে কখনো গান শেখেনি বিজন। অথচ দুঃখে-কষ্টে এই গানগুলো ওর বাঁচার প্রেরণা।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। বিজন বাড়ি ফিরছিল। পথে ললিতার সঙ্গে দেখা। ললিতা পাশের গ্রামের মেয়ে। কেমন একটা দূরের সম্পর্ক আছে ওদের দুই পরিবারের মধ্যে। ওই লতাপাতার সম্পর্ক।

ললিতাই প্রথম কথা বলে, ভালো আছো, বিজন দা।

বিজন বলে, হুঁ। তারপর জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো তোমরা, তোমার পড়াশোনার কি খবর।

আমি তো তোমার মতো পড়াশোনায় ভালো নই, এবার মাধ্যমিক ফাইনাল দেবো।

বিজনের মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। মায়ের সঙ্গে ওদের বাড়িতে কতবার গিয়েছে। লালিতার মা বড় ভালোবাসতেন বিজনকে। ললিতা তখন খুব ছোট।

ললিতা বলল, তুমি তো অঙ্কে ভালো, আমাকে একটু অঙ্ক শেখাবে, বিজন দা। বিজন রাজি হয়ে যায়।

বিকেলের দিকে অঙ্ক শিখতে আসতো ললিতা।

সন্ধ্যে হয়ে গেলে, নদীর পাড় ধরে বিজন প্রতিদিন ওকে এগিয়ে দিত। প্রতিদিন একই রুটিনে জীবন এগোচ্ছিল। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করল ললিতা।

সেদিন অদ্ভুত ভালো লাগা ছুঁয়ে গিয়েছিল বিজনকে। ধানক্ষেতের পাশে আলের উপর দিয়ে হলুদ শাড়ি পরে প্রজাপতির মতো ছুটতে ছুটতে এসেছিল ললিতা।

আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছি বিজনদা, অঙ্কে লেটার পেয়েছি। সব তোমার জন্য।

মুহূর্তে কি যে হয়েছিল বিজনের, ললিতার জন্য মনের মধ্যে অদ্ভুত ভালোবাসা

তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন মুখে কিছু বলতে পারেনি বিজন। বলেছিল, এক দুর্গাপূজার নবমীর সন্ধ্যায়।

সার্বজনীন দুর্গাপূজা গ্রামের। সকালবেলায় অঞ্জলি দিয়ে পুজো মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসছিল ললিতা। পাঞ্জাবী পাজামা পরে প্যান্ডেলে ঢোকার মুখে দেখা হয় দুজনের। ততদিনে বিএ পাস করে একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছে বিজন।

ললিতা ওকে দেখে হাসলো। বিজন বলল, অঞ্জলি দিতে এসেছিলে?

হ্যাঁ।

সন্ধ্যেবেলায় বের হবে?

কেন?

একটা কথা বলার ছিল।

আসবো।

আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

সন্ধ্যেবেলায় বড় দীঘির পাড় ধরে যাবার পথে বিজন ওকে ভালোবাসার কথা জানায়।

পুজোর দিনে ললিতাকে দেবী প্রতিমার মতো লাগছিল। গোলাপি বেনারসি শাড়িতে ও যেন তখন রমেশ পালের দুর্গা।

স্কুলে চাকরি পেয়েছি। তোমাকে ভালোবাসি ললিতা। তোমার ইচ্ছের কথা জানতে চাই।

আমার বাবা মা'র সঙ্গে কথা বলো, বিজনদা।

বিজন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ও বাড়িতে একদিন গিয়েছিল। ওরা মুখের ওপর নাকচ করে দেন। শুধু তাই না, ওর মা-বাবা ললিতাকে ওর কাকার বাড়ি কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়।

বিজন ভেঙে পড়ে। একলা হয়ে যায়। অথচ এমন ঘটনা ওর জীবেন না ঘটলেই তো পারতো।

জীবন সম্পর্কে ভরসা হারিয়ে ফেলেছিল বিজন। কখনো আর ললিতার খবর নেবার চেষ্টা করেনি। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

দিনগুলো গতানুগতিকভাবে চলে যাচ্ছিল বেশ। দুঃস্বপ্নের স্মৃতিগুলোও তো একসময় ফিকে হয়ে যায়।

বিজনের কলেজের বন্ধু পার্থিবের সঙ্গে দেখা একদিন। ও বলল, তোর ফিয়াসে ললিতা তো এখন সিনেমার নামকরা নায়িকা। নায়িকা মধুপর্ণা।

বিজন চমকে যায়। মুখে কিছু বলে না। কিছুদিন পর ও বিয়ে করে সুস্মিতাকে। তারপর গতানুগতিক জীবন, একটা গোলক ধাঁধা। প্রতিদিন একই বৃত্রে মধ্যে ঘুরপাক

খাওয়া। ছেলে বিমান কলেজে গেল। মেয়ে চিত্রিতা মাধ্যমিক পাশ করলো। বাঁধাধরা জীবন।

সেই বাঁধাধরা জীবনে একদিন আশ্চর্য এক সংবাদ এলো। সংবাদ নয়, যেন বিস্ফোরণ। গ্রামের লাইব্রেরীর অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠান করতে আসছেন সিনেমা জগতের বিশিষ্ট নায়িকা মধুপর্ণা।

এতে বিজনের কিছু এসে যায় না। ভাঙ্গা কাচের আয়নায় মুখ দেখার তাঁর কোনো ইচ্ছে নেই। কিন্তু বিজন এড়িয়ে যেতেও পারছে না।

সেদিন স্কুলে হঠাৎ ফোন এলো, বিজনের উদ্দেশ্যে।

ললিতা বলছি, তোমাদের ওখানে প্রোগ্রামে যাচ্ছি। তুমি স্টেজে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ললিতা দেখা করতে বললেও, বিজন নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তাছাড়া, সে এখন বিবাহিত। ছেলে মেয়েরা বড় হয়েছে। ইদানিং শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।

গ্রামে বিরাট আলোড়ন, নায়িকা মধুপর্ণা এখানে আসছেন। রাস্তাঘাট মেরামতের কাজ শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় পথের ধারে বাতিস্তম্ভ লাগানো হয়েছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠেছেন।

নির্দিষ্ট দিনে নায়িকা মধুপর্ণা মঞ্চে এলেন। প্রবল জনস্রোত চারিদিকে। মধুপর্ণা কাউকে খুঁজছেন। বারবার কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বিজন সান্যাল কি এসেছেন, এলে আমার কাছে ওনাকে ডেকে আনবেন।

একজন কর্মকর্তা বললেন, না ম্যাডাম, উনি আসেন নি।

অনুষ্ঠান শেষে মধুপর্ণা চললেন বিজন সান্যালের বাড়িতে। অসুস্থ বিজন তখন প্রায় অন্ধকার ঘরে জানালার কাছে শুয়ে আছেন। মধুপর্ণা ওর ছেলেমেয়েদের দেখলেন, বিজনের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা বলে গল্প করে সেই রাতে তিনি শহরে ফিরে গেলেন।

শহরে গিয়ে আবার যথারীতি ব্যস্ততা। কারণ, তিনি এখন শহরের ব্যস্ততম সেলিব্রিটি।

সপ্তাহখানেক বাদে থেকে প্রতিদিন রাত দশটা বাজলে তাঁর ফোন বেজে উঠতো। মধুপর্ণা কাজের মানুষ। তার ওপর শহরের নামকরা সেলিব্রিটি। এইসব ফোন ধরা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, এবং মোটেই মানানসই নয়। বিজনের কি আবার বুড়ো বয়সে প্রেম জাগলো। পরপর কয়েকদিন মধুপর্ণা বিজনের ফোন ধরেননি। ভেবেছিলেন, ফোন না ধরলে ওপারের ফোনকারী হতাশ হয়ে একসময় ফোন করা বন্ধ করবেন।

কিন্তু তা হলো না। আজ রাতেও যখন ফোনটা বেজে উঠলো, মধুপর্ণা নিজেই ফোনটি তুলে কড়া উত্তর দিতে প্রস্তুত হলেন। বললেন, কি ব্যাপার বিজনদা, রেগুলার

ফোন করে আমাকে ডিসটার্ব করছো কেন? ও প্রান্ত থেকে কথা ভেসে এলো। পিসী, আমি বিমান বলছি। আপনি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাবার পর, দু'দিন পরেই আমার বাবা মারা গিয়েছেন। শুধু এই সংবাদটা দেবার জন্যই আমি বারবার এ কদিন ধরে আপনাকে ফোন করে চলেছি।

এ্যাঁ, বিজনদা চলে গেল। চলে গেল, চলে গেল, চলে গেল।

তাঁর অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর উদাস হাওয়ায় বুকের পাঁজরের মই বেয়ে দীর্ঘশ্বাসের মতো ঝরে পড়ল। কাচের সার্সির ওপার থেকে উড়ালপুলের আকাশের দিকে চেয়ে মধুপর্ণা দেখলেন, আকাশ থেকে একটা তারা যেন দূরে কোথাও খসে পড়ল।

Krishanu Quarterly | Vol LIV/II & III | Regd No.
Rs. 40.00 | R. N. 16533/68

কৃশানু শতবর্ষ পেরিয়ে
এগিয়ে চলুক
এই কামনা করি।

নিভৃতা সেন
হিরণ্ময় সেন
— বেগমপুর

মদন দাস কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত ও
লোনস্টার সল্যুশনস, ৬২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।